আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া

জন্মশতবর্ষ উৎসব

১৯১৮-২০১৭

স্মারক গ্রন্থ

ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি

স্মারক গ্রন্থ

ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি
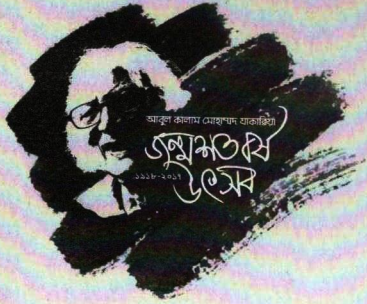
প্রকাশনা
ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি

সম্পাদনা
মারুফ শমশের যাকারিয়া
শাহীনুর রহমান
মাসুদুর রহমান
ইসমাইল হোসেন নিলয়
আযহার ফরহাদ
হাসিবা আলী বর্ণা
ফায়হাম ইবনে শরীফ
শরীফ আরেফিন রনি

প্রকাশকাল
১ অক্টোবর ২০১৭

নকশা ও মুদ্রণ
রেডলাইন

চেয়ারম্যানের কথা

জ্ঞানতাপস আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্মতত্ত্ব, পুঁথিসাহিত্যসহ জ্ঞানচর্চার নানা শাখায় কাজ করেছেন। প্রণয়ন করেছেন প্রাচীন বঙ্গ বিষয়ক বিভিন্ন আকর গ্রন্থ। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার সকল গবেষণা গ্রন্থের বিষয় প্রাচীন বঙ্গ। বাংলা অঞ্চলের প্রাচীন স্থাপত্য, নৃতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, সংস্কৃতি, নদ-নদী ইত্যাদি। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল প্রাচীন বঙ্গে। জ্ঞানচর্চার নানা শাখায় তিনি প্রাচীন বঙ্গকে অনুসন্ধান করেছেন আজীবন। তাঁর গবেষণা দেশকে প্রভূত সহায়তা করেছে। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে তাঁর গবেষণা অবদান রাখছে। যতই দিন যাবে, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার কাজের গুরুত্ব আরো বাড়বে।

প্রাচীন বঙ্গ চর্চায় আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া আমাদের প্রেরণার উৎস। তাঁর শততম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি আয়োজিত ‘আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া জন্মশতবর্ষ উৎসব’ উদযাপনের মাধ্যমে আমরা আরো অনুপ্রাণিত হব।

নিরন্তর কাজের মধ্যে থাকতেন আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া। ৯৭ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিদিন বাগানে কাজ করতেন তিনি। নিজে গবেষণা করেছেন, অন্যদের গবেষণা করতে উৎসাহিত করেছেন, সহায়তা করেছেন। বিদ্বৎসমাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন। দায়িত্ব পালন করেছেন বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের সভাপতি হিসাবে। বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন আজীবন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। খেলোয়াড় ছিলেন। কর্মজীবনে হয়ে ওঠেন ক্রীড়া সংগঠক। বিভিন্ন ক্লাব ও ক্রীড়া ফেডারেশনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সরকারের ক্রীড়া সচিব হিসাবে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন পুনর্গঠনে ভূমিকা রাখেন। বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সর্বশেষ ব্যাচের কর্মকর্তা হিসাবে তিনি যোগ দেন প্রশাসনে। চাকরি সূত্রে দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেছেন। যেখানে গেছেন, রেখে এসেছেন কীর্তি। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে তিনি যখন কক্সবাজারের মহকুমা প্রশাসক, তখন কক্সবাজারকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলেন। ষাটের দশকে যখন তিনি দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক তখন প্রতিষ্ঠা করেন দিনাজপুর জাদুঘর, যেটি প্রত্নবস্তু সংগ্রহের দিক থেকে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম জাদুঘর। তাঁর জীবন কীর্তিময়। তাঁর সর্বশেষ কীর্তি ঢাকার প্রাচীন শিলালিপি বিষয়ক গবেষণা কাজের তত্ত্বাবধান।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির কর্মকাণ্ড ঢাকা বিশ্বদ্যািলয়কে কেন্দ্র করে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে। এতে যুক্ত রয়েছেন দেশের বিশিষ্ট অনুবাদক, গবেষক, শিল্পী, আলোকচিত্রী, সাংবাদিক প্রমুখ। কমিটির সবচেয়ে প্রবীণ সদস্য ছিলেন আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া। তিনি পরিণত বয়সে তারুণ্যের উদ্যম নিয়ে কাজ করেছেন। ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির সদস্যদের নিয়ে তিনি

ঢাকার বিভিন্ন প্রত্নস্থলে গেছেন। প্রাচীন স্থাপত্য দেখেছেন, শিলালিপি দেখেছেন। কমিটির শিলালিপি জরিপের মাধ্যমে আবিষ্কৃত শিলালিপির পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনার কাজ তত্ত্বাবধান করেছেন তিনি। পাঠোদ্ধারকৃত শিলালিপি সম্পাদনার জন্য ২০০৯ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সভাসমূহে তিনিই সর্বাধিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া ঢাকার প্রাচীনকালের আরবী, ফার্সি ও উর্দু শিলালিপির পাঠ ও অনুবাদ সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করে গেছেন। ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির দুই খণ্ডে প্রকাশিতব্য 'ঢাকার এশীয় ভাষার শিলালিপি' গ্রন্থটি আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার সর্বশেষ এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ম হিসাবে বিবেচিত হবে।

জ্ঞানতাপস ও কর্মবীর আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার শততম জন্মদিন বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যপ্রেমী যে কোন মানুষের কাছে একটি তাৎপর্যময় দিন। জন্মশতবর্ষ উৎসব আয়োজনের প্রস্তুতিতে এগিয়ে এসেছেন তাঁর অনুরাগি শিল্পী, সাহিত্যিক, গবেষক, স্থপতি, সংস্কৃতি কর্মী ও সাংবাদিকরা। সহায়তা করেছে বিভিন্নভাবে। উৎসব আয়োজনে সহায়তা করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার পরিবারের সদস্যরা উৎসব আয়োজনে যুক্ত। সহায়তা করেছেন সার্বিকভাবে। বিভিন্ন পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির বিভিন্ন সময়ের কর্মকাণ্ড এবং উৎসব আয়োজনের সংবাদ গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করেছে। 'আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া জন্মশতবর্ষ উৎসব' আয়োজনে সহায়তাকারি সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

'আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া জন্মশতবর্ষ উৎসব' উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থের কাজ স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতে সম্পন্ন করতে হয়েছে। এ কারণে ভুলত্রুটি থাকতে পারে। বিষয়টি পাঠকরা বিবেচনা করবেন বলে আশা রাখি।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়াকে কমিটির সদস্যরা সব সময় স্মরণ করবে, অনুসরণ করবে। ভালো মানুষ হওয়ার শিক্ষা নেবে। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে আছেন।

(অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক)

সূচিপত্র

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া: জীবন বৃত্তান্ত

জন্ম: ১ অক্টোবর, ১৯১৮
গ্রাম: দরিকান্দি, উপজেলা: বাঞ্ছারামপুর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মৃত্যু: ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ ঢাকা
মা: আতিকুন নেসা, বাবা: মুনশি এমদাদ আলী মিঞা

শিক্ষাজীবন
এসএসসি: ১৯৩৯, বৃন্দাবন হাইস্কুল, রূপসদী, বাঞ্ছারামপুর (একাধিক ডিস্টিংশনসহ প্রথম বিভাগ ও হাজী মহসিন বৃত্তিপ্রাপ্ত)।
এইচএসসি: ১৯৪১, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (ঢাকা কলেজ) (প্রথম বিভাগ, ঢাকা বোর্ডে একাদশ স্থান লাভ)।
বিএ (অনার্স): ১৯৪৪ ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য।
এমএ: ১৯৪৫ ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য।
ডিপ্লোমা ইন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন: ১৯৪৮ (ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া, লস অ্যাঞ্জেলস, যুক্তরাষ্ট্র)

চাকরি জীবন
১৯৪৬-৪৭: প্রভাষক, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।
১৯৪৭: অবিভক্ত বাংলার শেষ বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে যোগদান। এসডিও চট্টগ্রাম, কক্সবাজার।
১৯৯৭২-৭৪: স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম-সচিব, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
১৯৭৪-৭৬: অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
১৯৭৬: বাধ্যতামূলক অবসর, সচিব, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
সদস্য, এডিটোরিয়াল বোর্ড, বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (১৯৭২-৭৬)।
সদস্য, প্রথম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়ন সরকারি কমিটি (১৯৭২)।
১৯৬৮: দিনাজপুর জাদুঘর প্রতিষ্ঠা, (প্রত্নসম্পদ সম্পদ সংগ্রহে জাতীয় জাদুঘর ও বরেন্দ্র জাদুঘরের পরেই দেশের বৃহত্তম জাদুঘর)।
২০০৮ থেকে আমৃত্যু সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ন, শিলালিপি সম্পাদনার দায়িত্ব পালন, ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি।

সাহিত্যকর্ম
রচিত গ্রন্থ প্রায় ৫০টি এবং প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৪০। প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গবেষণা, ফারসি ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ ও সম্পাদনা, সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের তালিকা

প্রত্নতত্ত্ব
১. বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও পরে দিব্যপ্রকাশ।
২. বাংলাদেশের প্রাচীন কীর্তি দুই খণ্ড- শিশু একাডেমি ও পরে দিব্যপ্রকাশ।
৩. Archaeological Heritage of Bangladesh (in English)- Asiatic Society of Bangladesh.

ইতিহাস
১. নবাব সিরাজ-উদ দৌলা।
২. বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি।

ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থের রচনা ও সম্পাদনা
১. কুমিল্লা জেলার ইতিহাস।
২. বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস।
৩. ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের ইতিহাস।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য
১. গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস- বাংলা একাডেমি ও পরে দিব্যপ্রকাশ।
২. বাংলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান।

মূল ফারসি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ
১. মিনহাজ-ই-সিরাজ রচিত তবকাত-ই-নাসিরী।
২. তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই মহাবতজঙ্গী।
৩. মোজাফফর নামা।
৪. নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানি।
৫. সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন।

সৃজনশীল সাহিত্য
১. গ্রাম বাংলার হাসির গল্প (২ খণ্ড)
২. মুক্তিযোদ্ধা, রাজাকার ও একটি তরুণী (উপন্যাস)

স্বীকৃতি ও পুরস্কার
১. একুশে পদক, ২০১৫।
২. বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ২০০৫।
৩. এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে দেয়া রাষ্ট্রপতি পুরস্কার।
৪. Felicitation Volume in honour of Mr. A.K.M Jakaria by Oxford University, England.
৫. গবেষণামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ইতিহাস একাডেমি, ঢাকা কর্তৃক স্বর্ণপদক।
এসব ছাড়াও এই লেখক আরও অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

ক্লান্তি কখনো ছুঁতে পারেনি আ কা মো যাকারিয়াকে

রেহেনা যাকারিয়া

এক সেকেন্ডের জন্যও হাত গুটিয়ে বসে থাকতেন না। হয় বই পড়তেন, নয়তো খবরের কাগজ পড়তেন। বিকেলে ছাদে বাগান করতেন। নিচে গাছের যত্ন নিতেন। নিজের হাতে গড়া ছাদের বাগানে তিনি ফলাতেন করমচা, কামরাঙা। তরিতরকারির গাছ লাগাতেন। গোলাপের প্রতি ছিলো তার মূল আকর্ষণ। আর পছন্দ করতেন বল লিলি।

রাত ৪টা পর্যন্ত বিছানার ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে কাজ করতেন তিনি। হঠাৎ হঠাৎ বলতেন, কিছু খেতে ইচ্ছা করে। আমি তার জন্য বিভিন্ন রকমের পিঠা বানিয়ে রাখতাম। হরলিক্স, ওভালটিন বানাতাম। ৪টার পর থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত ছিলো তার ঘুমের সময়। তারপর উঠে নাস্তা খেয়ে ফের ডুবে যেতেন বই পুস্তকে। এতো লেখাপড়া জানা, এতো জ্ঞানী একজন মানুষের অহংকার একদমই ছিলো না। তিনি ছিলেন ভীষণভাবে প্রচার বিমুখ। নীরবে কাজ করে গেছেন। সব কাজ শেষ করে যেতে পারবেন কি না সেটাই ছিলো তার প্রধান চিন্তা।

পড়ার জন্য বই, বেঁচে খাকার জন্য খাবার আর মাথা গোঁজার জন্য ছাদের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। গবেষণায় ডুবে থাকলেও পরিবারের প্রতি তাঁর দায়িত্ব ছিলো ষোলো আনা। ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার পরামর্শ দিতেন। রেজাল্ট খারাপ করলে রাগ করতেন। আবার আদরও করতেন। বাজার করতেন প্রচুর। নিজে খেতেন, মানুষকেও খাওয়াতে পছন্দ করতেন। ড্রাইভার, তরকারিওয়ালা, ফেরিওয়ালা, খবরের কাগজওয়ালা সবার সঙ্গেই তিনি গল্প করতেন তাদের মতো করে। নিজের পাশে বসিয়ে তাদের চা-নাস্তা খাওয়াতেন। খুব সহজেই তাদের সঙ্গে মিশে যেতেন তিনি। আগ্রহ নিয়ে তাদের গল্প শুনতেন। নিজের গল্প খুব একটা করতে দেখা যেতো না তাকে।

শখের বেড়ানোর কোনো ব্যাপার তার মধ্যে ছিলো না। তবে সারাদেশেই চষে বেড়াতেন তিনি গবেষণার কাছে। যেখানে সম্ভব হতো আমাকেও নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে। চলে যাওয়ার আগে আমার জন্য খুব বেশী চিন্তা করতেন তিনি। বলতেন, আমি না থাকলে তুমি তো নি:সঙ্গ হয়ে যাবে। একা থাকবে কি করে?

আসলে আমরা ছিলাম বন্ধুর মতো। কাজের ফাঁকে এক সঙ্গে আড্ডা দিতাম। টেলিভিশন দেখতাম। গান শোনা আর খেলাধুলা ছিলো তার হবি। তিনি নিজে গান গাইতেন না। কিন্তু শুনতেন। সুর বুঝতেন। যতো বড় শিল্পীই হোক, সুরের একটু এদিক ওদিক হলেই তিনি বলে উঠতেন আহহা। রবীন্দ্র সঙ্গীত ভারী পছন্দ ছিলো তার।

'৭০ এর দশকে হুইল বড়শি নিয়ে ধানমন্ডি লেকে যেতেন মাছ ধরতে। পছন্দ করতেন নিজে রান্না করতে। শুটকি রান্না করতেন। মাছ রান্না করতেন। ছোট বেলায় তার মা তাকে যেসব খাইয়েছেন

সেসবই রান্না করতেন। আমাকেও শিখিয়েছেন সেসব রান্না। ছেলে-মেয়েরাও সেসব রান্নাই পছন্দ করে। তিনি ছিলেন অসাধারণ হাজবেন্ড। বাবা হিসেবেও ছিলেন অসাধারণ। প্রতিবেশীদের প্রতিও তার ছিলো গভীর শ্রদ্ধা। এ কারণে সবাই তাকে পছন্দ করতো খুব।

সকাল থেকে শুরু করে গভীর রাত অবধি অনেক মানুষ আসতো বাসায়। তিনি সবাইকেই সময় দিতেন, হাসি মুখে সবার কথা শুনতেন। কিন্তু কলমটা তার কখনোই থামতো না।

শেষ বয়সে এসে ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির কাজে জড়িয়ে পড়েন তিনি। সে সময় তাকে অনেকটাই চাঙ্গা মনে হয়েছে। অসুস্থ শরীরেও ফিল্ডে গেছেন। যদিও তার শরীরের কথা চিন্তা করে আমরা তাকে ফিল্ডে যেতে দিতে চাইতাম না। কিন্তু তার আগ্রহের কাছে হার মানতে হতো।

কমিটির সদস্যরা এলে অনেক খুশি হতেন তিনি। কখনো কখনো আমিও তাদের সঙ্গে বসতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কি করে কেটে যেতো টের পেতাম না। ওদের সঙ্গে ৯৫ বছর বয়সেও উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ডাকসু ভবনে ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির অস্থায়ী কার্যালয়) যেতেন। মিটিং করতেন। প্রাচীন মসজিদ-মন্দিরে ঘুরতেন। বয়সের বিস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তিনি মিশে যেতেন তরুণদের সঙ্গে। মিটিং এর দিন সময়ের আগেই তৈরি হয়ে ছড়ি হাতে বসে থাকতেন। এতো বয়সের মানুষ এতো সময় সচেতন কি করে হতে পারে ভাবলেই অবাক লাগে। তার মতো জ্ঞানী মানুষ খুব বেশি পাওয়া যাবে না।

তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু আমলের সচিব, আপাদমস্তক একজন সৎ মানুষ। আদর্শ মানুষ। সততার কারণে তিনি অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত থেকেছেন। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে কখনো আপোস করেননি। এ কারণে অনেক চক্রান্তের শিকার হতে হয়েছে তাকে। প্রত্ন সম্পদ পাচারকারীরা সব সময় তার পেছনে লেগে ছিলেন। তাদের মূল হোতার ইন্ধনে জিয়াউর রহমানের আমলে নির্ধারিত সময়ের ৩ বছর আগেই তাকে রিটায়ার্টমেন্টে পাঠানো হয়। পরে তাকে রাষ্ট্রদূত হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন আদর্শবান মানুষ।

এই মানুষটা কিন্তু নিজের কাজের স্বীকৃতি শুরুর দিকে পাননি। শেষ বয়সে এসে একুশে পদক পেয়েছেন। যে সময় পেয়েছেন সে সময় অসুস্থতা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ওই পুরস্কারটা আরো আগে পেলে তার জন্য ভালো হতো। আরো অনেক পুরস্কারইতো তার পাওনা ছিলো।

তিনি যে যে কাজ অসমাপ্ত রেখে গেছেন সেগুলো কেউ এগিয়ে নিক। তার কথা যেনো মানুষ স্মরণ করতে পারে।

লেখক: সহধর্মীনী, আ কা মো যাকারিয়া

অবিনশ্বর এক প্রাণ আ কা মো যাকারিয়া

অধ্যাপক সামসুল ওয়ারেস

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া ছিলেন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মনস্ক, শুদ্ধ জ্ঞানচর্চায় নিবেদিত বহুমাত্রিক চরিত্রের অধিকারী এক মহান গুণীমানুষ। তিনি ছিলেন একাধারে প্রত্নতত্ত্ববিদ, পুঁথি সাহিত্য বিশারদ, মধ্য যুগের ইতিহাসবিদ, গবেষক, উপন্যাসিক, অনুবাদক, জাদুঘর প্রতিষ্ঠাতা, ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠক। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, সুশৃংখল, সময় সচেতন, প্রজ্ঞাবান, নিরহঙ্কার এবং কিছুটা লাজুক প্রকৃতির এক সুপুরুষ।

তিনি ২০১৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রায় ৯৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জন্ম ১৯১৮ সালের ১ অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় দরিকান্দি গ্রামে এবং মৃত্যু ঢাকায়।

প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার আগ্রহ তৈরি হয় কলেজে পড়ার সময় থেকে। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রত্নসম্পদের বিবরণ সম্বলিত প্রথম বই 'বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ'। সারাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলোর উল্লেখ তাঁর গ্রন্থে রয়েছে। বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ বিষয়ে এ ধরনের আর কোন গ্রন্থ নাই। বিধায় বইটি গবেষণার কাজে রেফারেন্স বই হিসাবে বিশেষভাবে বিবেচিত হয়।

ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও স্থাপত্য বিষয়ে আ কা মো যাকারিয়া বেশ কিছু গবেষণা প্রবন্ধ লিখেছেন। এসব প্রবন্ধে বাংলার প্রাচীন ভূগোল, নদীর গতিপথ, প্রত্নস্থানসমূহের জরিপ, বিশদ বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তাঁর ক্ষুরধার পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য দেয়। নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ যদুনাথ সরকার ও ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু। নীহাররঞ্জন রায় রচিত 'বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব' ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থ। উল্লেখিত ইতিহাসবিদের জ্ঞানচর্চার প্রতি নিষ্ঠা ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে ডিগ্রি লাভ করার পর আ কা মো যাকারিয়া বগুড়ায় আজিজুল হক কলেজে প্রভাষক (১৯৪৬-১৯৪৭) হিসেবে যোগ দেন। ওই সময় ছাত্রদের নিয়ে মহাস্থান গড়ের পুরাকীর্তি দেখে বিস্মিত হন তিনি। তাঁর ভাষায়, মহাস্থান গড়ের আকর্ষণ তাঁর জন্য সারা জীবনের আকর্ষণে পর্যবসিত হয়।

১৯৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এসে দিনাজপুরে সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে যোগ দেন তিনি। দিনাজপুরের প্রাচীন কীর্তি ও ধ্বংসাবশেষের বিশাল সম্ভার দেখে তিনি হতবাক হন। সারা জেলা ঘুরে তিনি আবিষ্কার করেন সীতাকোট বৌদ্ধবিহার। ওই সময় দিনাজপুর থেকে বদলি হয়ে ময়মনসিংহে যান। ১৯৬৭ সালে তিনি জেলা প্রশাসক হিসাবে পুনরায় দিনাজপুর ফিরে আসেন।

১৯৬৮ সালে সীতাকোট খনন করে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ

উদ্ধার করেন আ কা মো যাকারিয়া। ভাস্কর্য, পোড়ামাটির ফলক, মুদ্রা, লিপিফলক ইত্যাদি প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন দিনাজপুর জাদুঘর। বর্তমানে ঢাকার জাতীয় জাদুঘর ও বরেন্দ্র জাদুঘরের পরই দিনাজপুর জাদুঘরের স্থান। পুরাকীর্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই আ কা মো যাকারিয়া একজন আদর্শ প্রত্নতত্ত্ববিদ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সুলতানি আমলে ইতিহাস লেখা হয়েছে ফারসি ভাষায়। শিলালিপি লেখা হয়েছে আরবী ভাষায়। মুঘল আমলে ইতিহাস ও শিলালিপি উভয়ই লেখা হয়েছে ফারসি ভাষায়। বাংলার ইতিহাস জানতে হলে ফারসি ভাষায় লিখিত ইতিহাস পাঠ জরুরি। বিধায় আ কা মো যাকারিয়া এসব আকর গ্রন্থের অনুবাদ বাংলা ভাষায় করার কাজে লিপ্ত হন।

দিল্লির তৎকালীন প্রধান কাজী ও প্রখ্যাত পণ্ডিত মিনহাজ ই সিরাজ ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের প্রথমদিকের প্রামাণ্য ইতিহাস 'তবকাত-ই-নাসিরী' মোট ২৩ খণ্ডে রচনা করেন। এরমধ্যে বাংলার ইতিহাস রয়েছে তিনটি তবকাতে বা খণ্ডে। আ কা মো যাকারিয়া এই তিন খণ্ড বাংলায় অনুবাদ করেন। ১৯৮৩ সালে বাংলা একাডেমি পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার এই অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশ করে। বিশিষ্ট পণ্ডিত সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি ১৭৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দে 'সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন' রচনা করেন। ফারসি ভাষায় লিখিত ওই ইতিহাস গ্রন্থে মুঘল ভারতে আওরঙ্গজেব পরবর্তী সাতজন সম্রাট ও বাংলার নবাবদের বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ৯০৪ পৃষ্ঠায় (দুই খণ্ড) একত্রে প্রকাশ করেন। বাংলার নবাবি আমলের ইতিহাস নিয়ে করম আলী খানের লেখা 'মোজাফফরনামা' এবং ১৯২৯ সালে লেখা ইরান থেকে আগত পণ্ডিত আজাদ-আল-হোসায়নি'র নওবাহার-ই-মুর্শিদ কুলী খানি' গ্রন্থ দুটি ফারসি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। ১৯৯৮ সালে বাংলা একাডেমি প্রকাশ করে মোহাম্মদ যাকারিয়া কর্তৃক বাংলায় অনুবাদকৃত ইফসুফ আলী খানের লেখা বাংলার নবাবী আমলের ইতিহাস গ্রন্থ 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙ্গী'।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া ছিলেন পুঁথি সাহিত্য বিষয়ে মনোযোগী এক গবেষক। তরুণ বয়স থেকেই তিনি পুঁথি সংগ্রহ করতে শুরু করেন। তিনি হাতে লেখা ও কলকাতার বটতলা থেকে ছাপানো দুই ধরনের পুঁথি সংগ্রহ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সংগৃহীত ৭৫টি পুঁথির অনুলিপি রক্ষিত আছে। পুঁথি সাহিত্য বিষয়ে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ "গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস"। ৬০৮ পৃষ্ঠার বইটি ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমি প্রকাশ করে। তবে এরও আগে তিনি "বাংলাসাহিত্যে গাযী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান" শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৮৯ সালে বইটি প্রকাশিত হয়।

গাযী কালু ও চম্পাবতী কাহিনী নিয়ে অনেক কবিই কাব্য রচনা করেছেন। এদের মধ্যে আবদুর রহিম ও আবদুল গফুরের নাম জানা ছিল। আ কা মো যাকরিয়া ওই বিষয়ে লেখা আরো দুজন কবির পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। এরা হলেন খোদা বখশ ও হালু মীর। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থে, চারটি পুঁথির পাঠ তুলনামূলক বিচার করে পাঠ নির্মাণ করেন। গ্রন্থটির বিশাল ভূমিকায় রয়েছে, বাংলায় ইসলাম বিস্তার; রাজশক্তি ও সুফি দরবেশদের ভূমিকা; সূফি সাহিত্য এবং গাযী কাহিনীর উদ্ভব ও বিকাশ; গাযী কালু ও চম্পাবতী কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি এবং পাণ্ডুলিপি দুটির সাহিত্য ও ভাষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা।

নাথ ধর্মের কাহিনী নিয়ে অষ্টাদশ শতকের কবি শুকুর মামুদ লিখেছিলেন ‘গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস’ কাব্য। গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস ও নাথ ধর্ম নিয়ে ফয়যুল্লাহ, ভবানী দাসসহ বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিখ্যাত কবি কাব্য ও গান লিখেছেন। শুকুর মামুদের লেখা একটি পূর্ণাঙ্গ পুঁথি, দিনাজপুর থেকে আবিষ্কার করেন আ কা মো যাকারিয়া। পুঁথিটি তিনি সম্পাদনা করেন। বইটিতে ১৫২ পৃষ্ঠার ভূমিকায় রয়েছে নাথ ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ, তন্ত্র ও নাথ ধর্ম, ইতিহাসের নিরিখে গুপিচন্দ্রের কাহিনী, নাথ গুরুদের নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি– যা নাথ ধর্ম বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ অভিসন্দর্ভে পরিণত হয়েছে।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে পেয়েছেন ফারসি ভাষা ও পুঁথি-সাহিত্য চর্চার অনুপ্রেরণা। সরকারি আমলা হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিরলসভাবে শুদ্ধ জ্ঞানচর্চা করেন। ১৯৭৬ সালে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসাবে কর্মরত অবস্থায় বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করতে হয় তাকে। অবসরে যাওয়ার পর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, অনুবাদ ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা ও লেখালেখির কাজে লিপ্ত ছিলেন। প্রায় ৪০টি গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। ফারসি থেকে অনুবাদ করে এবং পুঁথি সাহিত্য পুন:নির্মাণ করে তিনি বাংলার ইতিহাসের যে ভিত্তি রচনা করেছেন তার ওপর নির্ভর করেই পরবর্তী প্রজন্মের ইতিহাসবিদরা ইতিহাস নির্মাণ করছেন।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডেও নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের (এশিয়াটিক সোসাইটির) সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। স্কুলে ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি ছিলেন তুখোড় ক্রীড়াবিদ। ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। দীর্ঘ সময় ছিলেন বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের সভাপতি। জাতীয় ফুটবল দলের ছিলেন ম্যানেজার।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া শিক্ষকতা দিয়ে শুরু করেছিলেন কর্মজীবন। ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে, বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সর্বশেষ ব্যাচের কর্মকর্তা হিসাবে তিনি যোগ দেন প্রশাসনে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিয়োগ পান ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সরকারের অধীনে।

তিনি ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অবিচল। অন্যায়কে কখনোই প্রশ্রয় দেননি। তার পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞা ছিল তুলনাহীন। ধর্ম ও বর্ণের উর্ধ্বে নির্মোহ থেকে তিনি গবেষণা ও লেখার কাজ করেছেন। রাজনীতির সঙ্গে কখনো যুক্ত হননি। তিনি বাংলা একাডেমি, এশিয়াটিক সোসাইটিসহ বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কার প্রাপ্ত। ২০১৫ সালে গবেষণা বিষয়ে অবদানের জন্য তাঁকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া লোভ-লালসার উর্ধ্বে অতি সহজ, সরল ও আনন্দময়, অথচ কর্মঠ ও বুদ্ধিদীপ্ত জীবনযাপন করেছেন। বাংলাদেশের এই মহান গুণী মানুষটি আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর মৃত্যুর অনেক আগেই তিনি জয় করেছিলেন মানুষের হৃদয়। রূপকথার এক জীবন্ত নায়ক ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর পর যতো দিন যাচ্ছে তাঁর অভাব ততোই অনুভূত হচ্ছে। তবে আশার কথা, তাঁর অগণিত ভক্ত ও শিষ্য আছেন, যারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আলোর পথ দেখাবেন।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও স্থপতি

মোহাম্মদ যাকারিয়া– একজন স্বদেশপ্রেমী, নিষ্ঠাবান গবেষক এবং অনন্য কর্মবীরের প্রতিকৃতি

নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস

আমাদের দেশে প্রত্নতত্ত্ব এবং পুঁথি সাহিত্যের গবেষকদের মধ্যে অন্যতম পুরোধা পুরুষ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া। তাঁর কর্মক্ষেত্রের পরিধি বহুবিস্তৃত। তবে উল্লিখিত দুটি ক্ষেত্রের গবেষণার জন্য তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আমৃত্যু গবেষণার প্রতি তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। দীর্ঘ জীবনও পেয়েছিলেন। শতবর্ষী হতে হতে তিনি চলে যান না-ফেরার দেশে। তাঁর জন্ম ১৯১৮ সনের ১ অক্টোবর এবং মৃত্যু ১৯১৬ সনের ২৪ ফেব্রুয়ারি। জন্মেছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর থানাধীন দরিকান্দি গ্রামে। মৃত্যু হয়েছিল ঢাকায়।

মোহাম্মদ যাকারিয়ার জন্ম হয়েছিল একটি সুশিক্ষিত পরিবারে। এই পরিবারে আরবী, ফারসির চর্চা ছিল দীর্ঘকাল থেকে। তাঁর পিতা মুনসি এমদাদ আলী মিঞা ছিলেন ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত। আরবী ভাষায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়াও শৈশবে, স্কুল ও কলেজ জীবনে ফারসি ভাষা অধ্যয়ন করেন। ফারসি ভাষা শিক্ষা তাঁর পরবর্তী জীবনে গবেষণার খুব সহায়ক হয়েছিল। কারণ তাঁর গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র ছিল বাংলার সুলতানি ও মুঘল শাসনকাল। আর এ দুটি কালের গবেষকদের জন্য ফারসি ভাষার জ্ঞান অপরিহার্য।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৩৯ সনে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন, ১৯৪১ সনে ঢাকা বোর্ডে দশম স্থান অধিকার করে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন, ১৯৪৪ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স এবং ১৯৪৫ সনে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তী সময়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায়ও তিনি উত্তীর্ণ হন।

তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে। এটি অবশ্য স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল। বগুড়ার আজিজুল হক কলেজে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের লেকচারার হিসেবে তিনি যোগদান করেন (১৯৪৬-৪৭)। বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সর্বশেষ ব্যাচের কর্মকর্তা হিসেবে তিনি যোগ দেন প্রশাসনে। ব্রিটিশ সরকারের অধীনে পরীক্ষা দিয়ে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন (১৯৪৬)। ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান সরকারের শাসনকালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ পান। এই পদে থেকে তিনি মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, নোয়াখালী, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে দায়িত্ব পালন করেছেন। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে তিনি এসডিও হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সরকারের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব, অতিরিক্ত সচিব এবং সচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৬ সনে সমর নায়কদের শাসনকালে তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়। বহুবিধ কর্মক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করেছেন এবং প্রতিক্ষেত্রে সফল হয়েছেন। ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে তিনি

জাতীয়ভাবে ফুটবল ও ভলিবলের দায়িত্ব পালন করেছেন।

মূলত সরকারের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনের সময় দেশের নানা স্থানের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও প্রত্নসম্পদের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং এ বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত হন। এ ক্ষেত্রে খ্যাতিমান ব্রিটিশ আমলা উইলিয়াম জোনস, কোলব্রুক, হান্টার, জেমস প্রিনসেফ প্রভৃতি কীর্তিমানদের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা যায়। প্রত্নসম্পদ ও ইতিহাস নিয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ'। দুই খণ্ডে প্রকাশিত প্রশ্নোত্তরে বাংলাদেশের প্রত্নকীর্তি, দিনাজপুর মিউজিয়াম, কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস প্রভৃতি তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি নীহাররঞ্জন রায় এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালীকে গুরু হিসেবে মান্য করেন। এ দু'জনের মধ্যে তিনি ভট্টশালীর সাহচর্য পেয়েছিলেন।

নৃতত্ত্ব নিয়েও তিনি গবেষণা করেছেন। 'বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর অধ্যয়ন এবং আকর্ষণের আর একটি বিষয় পুঁথি সাহিত্য। পারিবারিক ঐতিহ্যেই তিনি পুঁথির প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁদের বাড়িতে অনেক পুঁথি ছিল। সেখানে নিয়মিত পুঁথিপাঠ হতো এবং পুঁথিচর্চা হতো। তাঁর উল্লেখযোগ্য পুঁথি সম্পাদনা ও প্রকাশনা 'গুপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' এবং 'বাংলা সাহিত্যে গাযী কালু চম্পাবতী উপাখ্যান'। প্রথম গ্রন্থটি বাংলাদেশে নাথ সম্প্রদায় সম্পর্কে এবং দ্বিতীয় গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে গাযীর প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য বিখ্যাত।

তিনি শিশুতোষ গ্রন্থ এবং উপন্যাসও লিখেছেন। ফারসি ভাষায় লিখিত 'সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন'সহ কয়েকটি গ্রন্থ অনুবাদ করে তিনি বাংলার ইতিহাস বিশেষত মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার পথ অনেক সুগম করেছেন। দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ না থাকলে তাঁর পক্ষে এরূপ গবেষণায় আত্মনিয়োগ করা সম্ভব ছিল না। তিনি গবেষণা করেছেন নির্মোহভাবে। তাঁর গবেষণায় কোনো সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। দেশকে তিনি ভালোবেসেছেন, দেশের রাজনীতি সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন, কিন্তু কোনো দলের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন না। গবেষণা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য: আমি গবেষক। প্রত্যেক ধর্ম, বর্ণ ও দলের প্রতি নির্মোহ থেকে সত্য বলাটা আমার কাজ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৯৭১ সনে মোহাম্মদ যাকারিয়া চিটাগাং ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা সিডিএর চেয়ারম্যান ছিলেন। মৃত্যুর মুখ থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছেন। গোপনে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহায়তা করেছেন। পাক হানাদারদের বর্বরতার ভয়ঙ্করতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি তাঁর গ্রন্থ গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাসের ভূমিকার এক জায়গায় লিখেছেন: "সভ্যতার ক্রমবিকাশ থেকে আজ পর্যন্ত মানবতা এর চেয়ে জঘন্য রূপে বিপর্যস্ত হয়েছে কি না জানি না। ... একটু বাতাস, একটু শব্দ, সামান্য একটু অস্বাভাবিক আওয়াজ, কোনো বিশেষ ব্যক্তিগণের একটু চাহনি, টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং আওয়াজ– সব কিছুই মনে একটা দারুণ ভীতির সৃষ্টি করে– এই বুঝি এলো আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত।"

বাংলাদেশের এই কৃতী সন্তান তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে অনেক একাডেমিক পুরস্কার পেয়েছেন। বহু গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল। একটি তাঁর নিজ এলাকা বাঞ্ছারামপুর থানা কল্যাণ সমিতি। এই সমিতির তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও পৃষ্ঠপোষক। আর একটি ঢাকার প্রাচীন স্থাপত্য এর

শিলালিপি, আলোকচিত্র, চিত্রকর্ম ও স্থাপত্য নকশা বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রদর্শনী সংক্রান্ত একটি সংগঠন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (বর্তমানে প্রাক্তণ) অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সংগঠনটি পরিচালিত হয়।

ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির প্রধান কাজ হলো ঢাকার প্রাচীন শিলালিপি বিষয়ে জরিপ, আলোকচিত্র গ্রহণ, আরবী, ফারসি, উর্দু, সংস্কৃত, ল্যাটিন, পর্তুগিজ ও আর্মেনিয় ভাষার শিলালিপির পাঠোদ্ধার এবং অনুবাদ। এই অনুবাদ, সম্পাদনা, গবেষণার দিক নির্দেশনায় পূর্ণ নেতৃত্ব দিয়েছেন মোহাম্মদ যাকারিয়া। গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির সঙ্গে সার্বক্ষণিক যুক্ত তরুণ সরকার নামে এক তরুণের মাধ্যমে এই গবেষণা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমার সামান্য সম্পৃক্ততা হয়েছে। এই সুবাদে মোহাম্মদ যাকারিয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় লাভ। দুদিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা ও কথা হয়েছে। অত্যন্ত বিনয়ী নির্লোভ নিরহংকার মানুষ তিনি। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও পাণ্ডিত্যের মাধুর্যে একটি সংস্কৃত প্রবচন স্মরণ করছি: পতন্তি ফলিনঃ বৃক্ষাঃ নমন্তি জ্ঞানিনঃ জনাঃ। – বৃক্ষ ফলভারে নত হয়, আর মানুষ জ্ঞানভারে বিনীত হয়। এই জ্ঞানবৃদ্ধ কর্মবীরের শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে পয়লা অক্টোবর। এই সুযোগে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

[বর্তমান লেখাটির উৎস তরুণ সরকারের প্রণীত প্রবন্ধ 'বহুমাত্রিক আ ক ম যাকারিয়া' (সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক-এ প্রকাশিত)]।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও গবেষক

আ কা মো যাকারিয়ার জীবন ও কর্ম অনন্ত প্রেরণার উৎস্য

মওলানা নুরুদ্দিন ফতেহপুরী

নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই তিনি আসতেন। যেতেন সবার পরে। ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির ফারসি ভাষার সম্পাদক মণ্ডলীর প্রতিটি মিটিংয়ে এটাই ছিলো চিত্র।

৯৫ বছর বয়সেও কালজয়ী গবেষক আ কা মো যাকারিয়া'র এমন সময়ানুবর্তিতা আমাদের বিস্মিত করতো। কিন্তু বছর দু'তিন পর আমাদের সেই বিস্ময় যেনো সীমা ছাড়িয়ে গেলো। ওই মিটিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসহ বিভিন্ন জায়গা বা প্রতিষ্ঠান থেকে আসা পণ্ডিতরা ছিলেন। কিন্তু মিটিংয়ে সবচেয়ে বেশী উপস্থিতি তারই।

সমীহ করে তাকে বলতাম পিরানে পির (পিরদেরও পির)। ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, অনুবাদ, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব সব বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য সবারই শ্রদ্ধা আদায় করে নিতো। অভিজ্ঞতা, মেধা আর মননে তিনি ছিলেন নিরঙ্কুশ সম্মানের অধিকারি। এমন একজন মানুষকে পিরানে পির বলেও যথেষ্ট হয় না। তবু বলতাম। তিনি হাসতেন। প্রাণ খোলা হাসি। মনে হতো যেনো নিষ্পাপ কোনো শিশু হাসছে।

ডাকসু ভবনে পুরো মিটিংয়ে তিনিই থাকতেন আকর্ষণের কেন্দ্রে। তাকে ঘিরেই আবর্তিত হতো সব ঘটনা, সব কাজ। কিন্তু তিনি কথা বলতেন খুবই কম। শুনতেন বেশী। তার ধৈর্য্য আর আগ্রহ আমাদের অবাক করতো। সবার কথা মন দিয়ে শুনতেন। প্রয়োজন হলে মত দিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মিটিং চললেও কখনো ক্লান্ত হতে দেখিনি তাকে।

তার কর্মস্পৃহা আমাদেরও অনুপ্রাণিত করতো। তাকে দেখেই বুঝতাম, পেছনে কোনো কাজের টান রেখে ভাষা সম্পাদনার এমন মিটিংয়ে আসতে নেই। তাকে দেখেই বোধে আসে, কাজটাকে কী করে নিজের ভেতরে মিশিয়ে নিতে হয়। তিনি তো সবার কাছেই অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

কিন্তু কাজ পাগল হলেও তিনি কিন্তু কখনোই নিরস ছিলেন না। বরং বলা যায়, এমন মহীরূহ পর্যায়ের একজন মানুষ কম কথা বলেও সরস করে রাখতেন কাজের পরিবেশটাকে। কখনো ইতিহাস, কখনো সাহিত্য, কখনোবা প্রাচীন ইমারতের দেওয়াল থেকে তিনি তুলে আনতেন অনন্য সব উদাহরণ।

তিনি আমার শের ও কবিতার প্রশংসা করতেন। মিটিংয়ে উপস্থিত সবার দিকেই তাঁর ছিলো অন্তর্ভেদি আন্তরিক নজর। সবার খোঁজ খবর নিতেন অতীব যত্নে। যার যা প্রশংসা তাৎক্ষণিক তাতে ভূষিত করতে কোনো কুণ্ঠা ছিলো না তার। মিটিংয়ের আলোচনা কোনো কারণে কক্ষচ্যুত হলে শালীন পথে লাগামটাও তিনিই টানতেন। সব ধর্ম, বর্ণ ও মানুষের প্রতি তাঁর ছিলো সমান শ্রদ্ধা।

শুধু মিটিংয়ে নয়, প্রয়োজনে মাঠেও ছুটে যেতেন আ কা ম যাকারিয়া। তার মতো ৯৫ বছর বয়সে মাঠে ছুটে যাওয়ার এতো আগ্রহ আর কারো ভেতরে দেখেছি বলে স্মরণে আসে না।

ছড়িতে ভর করে তিনি যখন গবেষণার মাঠে যেতেন, তখন তার বয়স মনে হতো কমে যেতো অনেকটাই। প্রত্নতাত্ত্বিক দেওয়ালে তিনি এমনভাবে চাপড় দিতেন যেনো কোনো মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করছেন কালজয়ী এই কর্ম বীর। পুরনো ইঁট তুলে চোখের সামনে এমনভাবে ধরতেন, মনে হতো বুঝি ওই ইঁটের ভেতরে লুকিয়ে থাকা ভাষারই পাঠ উদ্ধারে মগ্ন হয়ে পড়েছেন তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুদোয়ারা নানকশাহীর পেছনে ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির প্রথম শিলালিপি প্রদর্শনীতে তো ছড়ি হাতে ঘুরে ঘুরে ঘন্টাই পার করলেন তিনি। সবার উদ্বেগের গোড়ায় পানি ঢেলে তাঁর রাজকীয় চলাফেরা বুঝিয়ে দিলো, এই বয়সেও কতোটা সামর্থ জমা আছে তার কর্মী শরীরের ভাঁজে ভাঁজে।

ধ্রুপদী ফারসির পক্ষে তার অবস্থান ছিলো আপোসহীন। তিনি ইতিহাসের সেবক। সাহিত্যের ধ্বজাধারী। অন্তহীন এক জ্ঞানের ভাণ্ডার। তার জীবন ও কর্ম অনন্ত প্রেরণার উৎস্য।

জন্ম শতবার্ষিকীতে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম।

লেখক: গবেষক ও লেখক

স্মৃতিগারে একটি নির্মল হাসি - আবুল কালাম যাকারিয়া

অধ্যাপক শামীম বানু

মমতাময় বাংলাদেশের উর্বর ভূমির আঁচলতলে যুগ যুগ ধরে বহু প্রতিভা জন্ম নিয়েছে, লালিত-পালিত ও বিকশিত হয়েছে। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া বাংলার আকাশের এক বহুমাত্রিক প্রতিভাবান নক্ষত্র, যাঁর দীপ্তি কখনো সাহিত্যিক, কখনো পুঁথি সাহিত্য বিশারদ হয়ে স্ফূরিত হয়েছে। আবার কখনো প্রত্নতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, ইতিহাস চিন্তাবিদ, ইতিহাস সাহিত্য অনুবাদক হয়ে ঝিলমিল করে উঠেছে।

আজ ১ অক্টোবর (২০১৭) তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী। এ উপলক্ষে তাঁর পরিবার, তাঁর অনুগামী সকল জ্ঞানচর্চাকারীকে জানাই সহস্র অভিনন্দন। আমরা অর্থাৎ ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি কয়েক বছর আগে থেকে এই দিন উদযাপন উপলক্ষে যাকারিয়া স্যারকে অভিভূত করার জন্য প্রহর গুনছিলাম। কিন্তু নিয়তির পরিহাস, তিনি তিন বছর আগে আমাদের হতাশ করে আখেরাতের পথে এগিয়ে গেলেন। আল্লাহ তাঁকে বেহেশ্‌তবাসী করুন।

তিনি একজন নিষ্ঠাবান গবেষক ছিলেন। আমি দেখেছি, শেষ দিনগুলোতে হাসপাতালের শয্যায় অর্ধ অজ্ঞান অবস্থায় হাতের আঙুল দিয়ে শূন্যে কি যেন লেখার চেষ্টা করতেন। যেন কোনো অসমাপ্ত গবেষণা কর্ম সমাপ্ত করতে চাচ্ছেন। ইরানি পণ্ডিত আবু রায়হান বৈরুনি জীবনের শেষ মুহূর্তে জ্ঞান বিষয়ক একটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছিলেন। উত্তরটি পেয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। যাকারিয়া স্যারের মধ্যে বাংলার আল বৈরুনিকে খুঁজে পেলাম। সহস্র শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁর প্রতি।

২০১২ সালের জুন মাসে ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির এক পত্রে আমাকে তাদের সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সভাস্থলে এসে ফারসি ভাষা বিষয়ক অনেক পরিচিত পণ্ডিতের মধ্যে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে দেখলাম। লম্বা সুস্বাস্থ্যবান একজন। চেহারায় পাণ্ডিত্য ও আভিজাত্যের ছাপ ফুটে ছিলো। পরিচয় হলো। তিনি ফারসি ইতিহাস সাহিত্যর অনুবাদক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া।

৯০-উর্ধ্ব এক পণ্ডিত আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। তুর্কি কায়দায় সালাম ও কুশল বিনিময় করলেন। শিষ্ঠাচার ও বিনয়ের এক বিরল উদাহরণের সাক্ষাত পেলাম। এরপরে প্রত্যেক দুই সপ্তাহ অন্তর সভায় উনার সাথে দেখা হতো। তিনি সভায় সবার আগে আসতেন। আলোচনায় তেমন কথা বলতেন না। কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে সবার কথা ধৈর্য্যের সাথে শুনতেন। প্রয়োজনবোধে সবার শেষে নিজের মতামত প্রকাশ করতেন।

তিনি ক্লাসিক লোক ছিলেন। ক্লাসিক ফারসির অনুরাগী ছিলেন। আধুনিক ফারসি বিশারদরা

একমত না হলেও কখনো নিজের মতামত চাপিয়ে দিতেন না। অন্যদের মতামত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে শুনে নিজের পরামর্শ দিতেন।

ফারসি ভাষায় কথা বলতে পারতেন না, কিন্তু ফারসি সাহিত্যের মুখ্য বিষয়গুলোকে খুব পাণ্ডিত্যের সাথে উপলব্ধি করতে পারতেন তিনি। পারিবারিক সূত্রে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের আরম্ভ থেকে অন্ত পর্যন্ত তিনি ফারসি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নে সম্পৃক্ত ছিলেন। ম্যাট্রিকে ফারসি দুটি পত্রে লেটার লাভ করেন। ইন্টারমিডিয়েটে ১০০ এর মধ্যে পান ৭০ নাম্বার। বিবিএস পরীক্ষায় ফারসিতে ৩০০ এর মধ্যে অর্জন করেন ২০৭ নম্বর (বহুমাত্রিক আ ক ম যাকারিয়াঃ তরুণ সরকার, সাপ্তাহিক)। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের শিক্ষার্থী হওয়া সত্ত্বেও ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ফারসিকে গ্রহণ করেছিলেন। এখানেই তখনকার ফারসি পণ্ডিত শিক্ষক ড. মইদুল ইসলাম বোরাহ, ড. আন্দালীব শাঁদানী প্রমুখের সান্নিধ্য লাভ করেন। বাংলা মাতৃভাষা, ইংরেজি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবৃত্তির ভাষা, ফারসি ভালবাসার ভাষা। এসব ভাষা শিক্ষায় সোনায় সোহাগা হয়ে তিনি শিক্ষা ও কর্মজীবনে জ্যোতি ছড়াতে শুরু করেন।

তাঁর প্রকাশিত কর্মগুলোর মধ্যে উত্তম কর্মগুলো হলো ফারসি ভাষা থেকে বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস বাংলা ভাষায় অনুবাদ। তিনি মূল ফারসি গ্রন্থ ও এর ইংরেজি অনুবাদকে সামনে রেখে বাংলা ভাষায় এগুলো অনুবাদ করেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থের টিকায় এদের ইংরেজি অনুবাদকের ভাষা, ভাব ও অর্থের ভুল-ত্রুটির যে নির্দেশনা তিনি দিয়েছেন তা বিস্ময়কর এবং ক্লাসিক ফারসি ভাষার উপর তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রমাণস্বরূপ (তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙ্গীঃ পৃষ্ঠা ৬০, ৬৬)।

তিনি ফারসি থেকে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন মীনহাজ-ই-সিরাজ রচিত তবকাত-ই-নাসিরী। উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের প্রথম দিকের প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। ২৩ খণ্ডের গ্রন্থে বাংলার ইতিহাস রয়েছে ২০, ২১ ও ২২ তবকতে (স্তর-অধ্যায়)। জনাব যাকারিয়া উল্লিখিত ৩টি তবকত-এর বাংলা অনুবাদ করেন। ১৯৮০ সালে বাংলা একাডেমি থেকে এটি প্রকাশিত হয়। ২০০৭ সালে গ্রন্থটির পরিবর্তিত সংস্করণ, দিব্য প্রকাশ থেকে প্রকাশিত হয়।

বাংলার নবাবি আমলের ইতিহাসভিত্তিক দুটি ফারসি গ্রন্থ করম আলী খান রচিত মোজাফ্‌ফরনামা ও ১৭২৯ খৃস্টাব্দে আজাদ-আল-হোসায়নি রচিত নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানি জনাব যাকারিয়া বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৯৯৮ সালে বাংলা একাডেমি থেকে গ্রন্থদ্বয় একত্রে প্রকাশ পায়।

ইউসুফ আলী খান রচিত তারিখ-ই-বাঙ্গালা-মহাবতজঙ্গী-এর বাংলা অনুবাদ জনাব যাকারিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম। ১৯৯৭ সালে বাংলা একাডেমি থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

ইতিহাস অনুবাদক হিসেবে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হলো ১৭৮০-৮১ খ্রিষ্টাব্দে সৈয়দ গোলাম হোসেন খান রচিত সিয়ার-উল্‌-মুতাখ্‌খিরিন এর অনুবাদ। ফারসি ভাষায় লিখিত তিন খণ্ডের এই গ্রন্থে মুঘল ভারতের আওরঙ্গজেবের পরবর্তী ৭ জন সম্রাট এবং বাংলার নবাবদের বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া ভারতের সম্রাটদের অংশটুকু বাদ দিয়ে বাংলার নবাব শুজা-উদ-দৌলা মোহাম্মদ শুজা-উদ-দীন

খানের অভ্যুদয়ের আমল থেকে মূল গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের সমাপ্তি পর্যন্ত ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে হাজী মোস্তফা কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ আকারে এটি অনুবাদ করেন। তাঁর অনূদিত দুই খণ্ড বিশেষ সিয়ার-উল্-মুতাখ্খিরিন ২০০৬ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশ পায়।

জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া জীবনের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত কর্মব্যস্ত সময় কাটান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির প্রধান চাবি-কাঠি ছিলেন তিনি। এখানে ঢাকার ফারসি, আরবী, উর্দু, সংস্কৃত, লাতিন, পর্তুগিজ, আর্মেনীয়সহ বিভিন্ন ভাষার শিলালিপি আবিষ্কারের পর পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ তত্ত্বাবধান তিনি করতেন। সংস্করণের কাজে তিনি নিয়মিত সভাস্থলে আসতেন। কমিটির সদস্যদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি ছিলো সর্বাধিক। সবার আগে আসতেন, সবার শেষে যেতেন। সভায় উপস্থাপিত শিলালিপি ব্যতীত অন্যান্য সাহিত্যিক রসালো কথোপকথন, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস ভিত্তিক আলোচনা নিয়ে আড্ডা জমত। তাঁর মুখে সর্বদা নির্মল হাসি লেগে থাকত।

বাকরখানি নান তাঁর প্রিয় নাশতা ছিল। আপ্যায়নে তাঁর বন্দোবস্ত থাকত। কোথাও কোনো অনাবিষ্কৃত শিলালিপির সংবাদ পাওয়া মাত্র সেখানে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠতেন। তাঁর সাথে একটি শিলালিপির সন্ধানে ঢাকার মান্ডা এলাকা যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। বিস্মিত হয়ে দেখলাম, দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য থেকেও সামনে, সবার অগ্রভাগে তিনি হেঁটে যাচ্ছেন। কাদা-মাটি, ভাঙ্গা বা সংকীর্ণ রাস্তা, গলি কিছুরই তোয়াক্কা করছিলেন না তিনি। তারপর নির্দিষ্ট স্থান অবলোকনমাত্র সেখানকার ঐতিহাসিক দিক নির্দেশনা দেওয়া শুরু করলেন।

আজ আমরা বাংলার সেই ইতিহাস নির্দেশককে হারিয়েছি। তিনি একজন নির্মোহ, নিরহঙ্কার পণ্ডিত ও গবেষক ছিলেন। সবাইকে অত্যন্ত সম্মান ও বিনয়ের সাথে সম্বোধন করতেন। আমাকে ম্যাডাম বলে ডাকতেন। খুব সঙ্কোচবোধ করতাম। তিনি আমাদের স্মৃতিগারে, হৃদয়ঘরে রয়েছেন। তিনি তাঁর কর্মের মাধ্যমে অমর হয়ে থাকবেন। আল্লাহ্ তাঁকে মাগফেরাত দান করুন।

তথ্যসূত্র

১। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (অনুবাদক): তবকাত-ই-নাসিরী - মীনহাজ-ই-সিরাজ - ১৯৮৩, বাংলা একাডেমি
২। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (অনুবাদক): তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙ্গী - ইউসুফ আলী খান - ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি
৩। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (অনুবাদক): নওবাহার-ই মর্শিদকুলী খানি- আজাদ-আল-হোসায়নি - ১৯৯৮, বাংলা একাডেমি
৪। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (অনুবাদক): মোযাফ্ফরনামা - করম আলি খান - ১৯৯৮, বাংলা একাডেমি
৫। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (অনুবাদক): সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন - সৈয়দ গোলাম হোসেন খান - ২০০৬, দিব্য প্রকাশ
৬। বহুমাত্রিক আ ক ম যাকারিয়া: তরুণ সরকার, সাপ্তাহিক

লেখক: অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট

বিস্ময়-মানব

মোজাম্মেল হোসেন

তাঁকে জেনেছিলাম তাঁর রচিত গ্রন্থের মাধ্যমে। কেন যে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হইনি, সান্নিধ্যে আসিনি, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, এ আক্ষেপ আমার আমৃত্যু। এটা অবশ্য আমার নিজের স্বভাবজাত অন্তর্মুখিনতার শাস্তি। যেদিন এবং জীবনে সেই একবারই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপে শুধু সৌজন্য বিনিময়টুকু হলো সেদিন আবার মানলাম তিনি একজন বিস্ময়-মানব, যা আমার মনে হয়েছিল একজন সরকারি চাকরিজীবী হয়েও তাঁর গবেষণা ও রচনার পরিধি ও গভীরতা দেখে।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার সঙ্গে একই টেবিলে বসলাম ২০১৫ সালের এক সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ বা ডাকসুর কার্যালয় ভবনটির এক ঘরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আআমস আরেফিন সিদ্দিকের সিদ্ধান্তে কক্ষটি ব্যবহার করে ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি তাদের কাজের জন্য। উপাচার্য স্বয়ং এই কমিটির চেয়ারম্যান। ২০০৮ সালে একদল তরুণের আগ্রহে একেবারে ওদেরই উদ্যোগে ওদেরই পকেটের টাকায় এই সৌখিন একাডেমিক প্রকল্পটিতে আমন্ত্রিত হয়ে যুক্ত হয়েছিলাম। ঘুরে বেড়িয়েছি ঢাকার বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন ও মধ্যযুগের স্থাপত্য নিদর্শনগুলোতে; বিশেষ ফলাফল লাভ হয়েছিল সুলতানি, মুঘল ও কোম্পানি আমলের অনেক মসজিদ ও অন্য স্থাপনার শিলালিপি খুঁজে পাওয়া। এগুলো ছিলই, মনোযেগের বাইরে, পাঠোদ্ধার হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগেই আমার অনুজপ্রতীম ছাত্র ও পরে পেশাদারি সাংবাদিকতায় এককালীন সহকর্মী তরুণ সরকার এই প্রকল্পের মূল উদ্যোক্তা। আদ্যন্ত এর নেপথ্য সূত্রধর। প্রচারবিমুখ। তরুণ সরকারের নেতৃত্বে কিছু তরুণের ঐকান্তিকতা ও উদ্দেশ্যের সততায় আকৃষ্ট হয়ে ইতিহাস, স্থাপত্য, প্রত্নতত্ত্ব, আরবী, ফারসি, সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিতরা এ কাজটিতে যুক্ত হয়েছেন। ডাকসু ভবনের ঘরটিতে তাঁদের আনাগোনা, নিতান্ত আটপৌরে পরিবেশে অতি সাধারণ চেয়ার-টেবিলে বসে তাঁদের কাজ করা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হতো। ছবি তুলে আনার পর যখন আরবী. ফারসি, সংস্কৃত, পর্তুগিজ, লাতিন, আর্মেনীয় প্রভৃতি ভাষার শিলালিপিগুলির পঠোদ্ধার, অনুবাদ ও অন্যান্য কাজ চলছিল তখন আমি খুব কমই গেছি। হঠাৎ সেই সকালে হাজির হয়ে পেলাম আ কা মো যাকারিয়া স্যারকে। আমাকে কেউ পরিচয় করিয়ে দিলেন সাংবাদিক হিসেবে। প্রায় একই সঙ্গে তিনিও হাত উঁচিয়ে সালাম দিয়ে এমনভাবে কথা বললেন যেন সমবয়ষ্ক সমকক্ষ কারও সঙ্গে কথা বলছেন। আমার সঙ্গে তাঁর বয়সের ব্যবধান ৩০ বছর। অনেকের কাছে শুনেছি তাঁর প্রবাদপ্রতিম বিনয় ও সৌজন্যের কথা। সেদিন সেই টেবিলে আরও ছিলেন অধ্যাপক আনম রইসউদ্দীন, মওলানা নুরুদ্দিন ফতেহ্পুরী, অধ্যাপক শামীম বানু, অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম। শিলালিপির ফারসি ও আরবী অনেক পুরানা এবং বর্তমান আরবী-ফারসির সঙ্গে মিল কম বলে অনুবাদ দুরূহ ছিল এবং পণ্ডিতদের অনেক পারস্পরিক সলাপরামর্শ করতে হতো। যাকারিয়া স্যারের বয়স তখন ৯৭ বছর। প্রতিটি বিষয়ে অনুপুঙ্খ মনোনিবেশ ও ক্লান্তিহীন শ্রম দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। তরুণের কাছে শুনেছি তিনি প্রতিটি বৈঠকে ঠিক সময়মতো উপস্থিত হন এবং কাজ শেষ করেই সময়ক্ষেপণ না করে চলে যান। ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থের কাজটি ছাড়া তখন তিনি নিজের জন্মস্থান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর থানা কল্যাণ সমিতির সাংগঠনিক কাজে সময় দিতেন। তরুণ সরকার তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে শুনেছেন শেষ বয়সে এই স্থাপত্য প্রকল্পটিতে যুক্ত হয়ে তিনি শারীরিক-মানসিকভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলেন।

এই কথাটা শুনে অবাক হয়েছিলাম এজন্য যে, আ কা মো যাকারিয়ার জীবনভর একান্ত ব্যক্তিগত প্রকল্প বা কাজগুলো তো পর্বতপ্রমাণ বা সমুদ্রতুল্য। উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের সূর্যাস্তের সময়

বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ হয়ে পাকিস্তানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চাকরি শুরু করেন। এই তথ্যগুলো খুব আকর্ষণীয় যে, পূর্বপুরুষ তুর্কি হওয়ায় এই বাঙালি মুসলমানের বংশধারায় অনেক আগে থেকেই শিক্ষা ছিল। সেটা অধিকাংশ বাঙালি মুসলমানের মতো না। সেই শিক্ষাটা ফারসিতে। যাকারিয়া স্যারের পিতা, পিতামহের আরবী ও ফারসিতে পাণ্ডিত্য ছিল এবং পরিবার সেই আবহে গড়া ছিল। তাঁর নিজেরও শিক্ষা আরবী ও কুরআন দিয়ে শুরু, কিন্তু যুগের পরিবর্তনে তাল রেখে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুলেন ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে। ফলে তাঁর স্বীয় উৎসাহ থেকে একাডেমিক ও গবেষণা চর্চায় এই শিক্ষা প্রভূত কাজে লেগেছে।

চাকরি জীবনে ঘুরে ঘুরে দেশের প্রত্নসম্পদ খুঁজে বেড়াতেন। চাকরি জীবনেই প্রকাশিত 'বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ' নামক অবিস্মরণীয় গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে এই দেশে বাস্তবে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার দ্বারোন্মোচন ঘটায়। সে যুগে সরকারি আমলা কর্মচারীরা মেধাবী ছাত্রদের মধ্য থেকেই আসতেন বলে এমন একটি ধারা ছিল। যেমন, জেমস রেনেলের বাংলার নদীর ঠিকুজি ও মানচিত্র তৈরি রিভার সার্ভে অফ বেঙ্গল। তিনি নৌকায় নদী চষে বেড়াতেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের ইউলিয়াম হান্টারের ইমপেরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের এস এন এইচ রিজভীর পূর্ব পাকিস্তানের জেলা গেজেট ঐতিহাসিক মৌলিক ধরনের কাজ। তবে আ কা মো যাকারিয়ার কাজের বৈচিত্র্য ও গভীরতার মাত্রা আমাকে বেশি আকর্ষণ করে। কোনোভাবেই প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না নিয়ে তিনি যে কাজ করে রেখে গেলেন তা আমাদের এই শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকেই কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধে দিল।

রচিত গ্রন্থ তাঁর ৫০টি হবে। প্রকাশিত হয়নি সব। নিজ আনন্দে উপন্যাস লিখেছেন, যেগুলো রয়েছে অপ্রকাশিত। দেশের প্রত্নসম্পদগুলোর ঠিকুজি সন্ধান, বিবরণ ও বিশ্লেষণ ছাড়া তাঁর বড় কাজ মধ্যযুগের ইতিহাসের উৎসস্বরূপ ফারসি কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থের মূল থেকে বঙ্গানুবাদ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'তাবকাত-ই-নাসিরী'র বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসের তিনটি খণ্ড, 'মোজাফফরনামা' ও 'সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরিন'। ইতিহাসের ছাত্র ও গবেষক যারা মৌলিক গ্রন্থ পড়তে চাইবেন তাদের যে তিনি কী উপকার করেছেন তা বলে বোঝানো যাবে না।

সমাজকে গভীরে বোঝার জন্য পুঁথিসাহিত্যের প্রতি আ কা মো যাকারিয়ার গভীর অনুরাগ ছিল। প্রত্নসন্ধানের মতোই তিনি চাকরি জীবনেও বিভিন্ন এলাকা থেকে পুঁথি সংগ্রহ করেছেন। দুটি অবিস্মণীয় কাজ তাঁর 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস' এবং 'বাংলা সাহিত্যে 'গাযী-কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান'। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ের ছাত্রদের আকরগ্রন্থের উপকার দেয়। বাংলার সমাজে এক সময় বিশেষ প্রভাব সৃষ্টিকারী নাথ ধর্মের বিষয়ে জানতে এই গ্রন্থের এখন বিকল্প নেই।

ব্যক্তি হিসেবে আ কা মো যাকারিয়া অত্যন্ত সৎ হিসেবে সম্মান পেয়েছেন। আমি মুগ্ধ ও শ্রদ্ধায় আনত তাঁর একাডেমিক সততার প্রতি। পরিশ্রম ও গ্রন্থ রচনার পেছনে নাম কেনার কথা নিশ্চয় তাঁর চিন্তায়ও আসেনি। তিনি শুধু অনুবাদ করে রেখে যাননি। বিস্মিত হতে হয় বইগুলোর টীকা, ভাষ্য, ভূমিকা, উপক্রমণিকা দেখলে। তাঁর অনুবাদে প্রকাশিত পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার 'তাবকাত-ই-নাসিরী'র ১৫৪ পৃষ্ঠা উপক্রমণিকা যাকে নিঃসন্দেহে একটি অসাধারণ গবেষণা অভিসন্দর্ভ বলা যায়। গাজী-কালু চম্পাবতী নিয়ে বইটির ভূমিকা ১৬৩ পৃষ্ঠা। আর তাঁর সম্পাদিত ৬০৮ পৃষ্ঠার 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস'-এর শুরুতে ১৫২ পৃষ্ঠার ভূমিকা ও শেষে ২৬৫ পৃষ্ঠাজুড়ে আছে টীকা ও শব্দার্থসূচি। এতে অভিনিবেশ ও গবেষণার ব্যাপ্তি-গভীরতা বোঝা যায়।

আ কা মো যাকারিয়া বন্ধুজনদের বলতেন, তিনি মেধাবী নন, পরিশ্রমী। কঠোর পরিশ্রম তাঁর জীবনকীর্তির চাবিকাঠি সন্দেহ নেই। তবে তাঁর কাজে মেধার স্বাক্ষর কেউ অস্বীকার করবে না। আর তাঁর কথাটা সকল মানুষের জন্যই শিক্ষা।

লেখক: সাংবাদিক

স্মৃতিকথা: প্রসঙ্গ আ কা মো যাকারিয়া

মোহা. মোশাররফ হোসেন

১৯৮৪ সালের কোনও একটি দিন। হঠাৎ একটা চিরকুট পেলাম। 'আপনাকে জনাব আ কা মো যাকারিয়ার (খ্রি.১৯১৮- ২০১৬) সাথে দিনাজপুর যেতে হবে। তিনি তেমনটাই জানিয়ে আপনাকে অনুরোধ করতে বলেছেন।' তখন আমি সবে মাত্র প্রত্নতত্ত্বের অঙ্গনে হাঁটিহাঁটি পা পা করে এগুতে শুরু করেছিলাম। স্বভাবতই একটু থ্রিল অনুভব করেছিলাম। কারণ এ নামটা আমার বিশেষভাবে পরিচিত। আমি কাঁঠাল বাগানের বাসিন্দা। আর জনাব যাকারিয়া থাকেন কলাবাগান। তাছাড়া তার কয়েকটি বই আমি পড়েছি। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো 'বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ'। এছাড়া আরও পড়েছিলাম 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস'। লেখার মধ্যে একটা বৈপরিত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম এ জন্য যে, এ দুটির একটা হলো পুরাকীর্তি বিষয়ক এবং অন্যটি সাহিত্য বিষয়ক। তাছাড়া দিনাজপুর যাবো। দিনাজপুরের ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে আমার তেমন একটা সখ্যও ছিল না। সুতরাং কোনও অবস্থাতেই এ সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

যা হোক রাজি হয়ে গেলাম। যিনি চিরকুট পাঠিয়েছিলেন তাঁকে জানিয়ে দিলাম। তিনি জানালেন যে, তাহলে আমি যেন আগামী সোমবার সকাল সাতটায় আমার মোহাম্মদপুর অফিসে উপস্থিত থাকি। সেখান থেকেই জনাব জাকারিয়া আমাকে নিয়ে যাবেন। সেই প্রথম সাক্ষাৎ। আমি যুবক। তিনি প্রবীণ। অথচ আমি বুঝে ওঠার আগেই তিনি আমাকে সালাম দিয়ে বসলেন। লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলাম। তবে সেটিরও পুরোপুরি সুযোগ তিনি দিলেন না। যে কথাগুলো আমার বলা উচিৎ ছিল সে কথাগুলো তিনিই বলতে শুরু করে দিলেন। 'আপনার কথা অনেক শুনেছি। শুনেছি দিনাজপুর প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদন লেখার দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়েছে। তাই আপনাকে নিয়েই দিনাজপুর যেতে চাই। সময় কাটবে ভাল। আপনার কাছ থেকে অনেক অজানা কথা জেনে নেয়া যাবে।' লজ্জার পর লজ্জা লতার মতো আমাকে পাকড়াও করে (করলো) ধরলো। অথচ তাঁর বিনয়ের দাপটে সেটাও প্রকাশ করার শক্তি হারিয়ে ফেললাম। বাকি পথটাও এভাবেই কেটেছিল। আমি নির্বাক, তিনি সবাক।

কতো কতো কথা। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অজ পাড়াগাঁয়ের বাওবাতাসে বেড়ে ওঠা মানুষ তিনি। সেখানেই স্কুল জীবন শেষ করে ঢাকা এসেছিলেন। সে ঢাকাতেই অতিক্রম করেছিলেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবন। বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন খেলোয়াড় হিসেবে। কর্মজীবনের সূচনা করেছিলেন শিক্ষকতা দিয়ে। কিন্তু বছর কাটতে না কাটতেই মোড় ঘুরে গিয়েছিল। সরকারি প্রশাসনে যোগ দিতে হয়েছিল। আর সে সুবাদেই ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল বিভিন্ন জেলা। প্রতিটি জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক নিদর্শনাদি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। পরিচিত হতে পেরেছিলেন স্থানীয় কিছু ইতিহাস সচেতন ক্ষ্যাপাটে ব্যক্তিবর্গের সাথে। তাঁদের অধিকাংশই তখন নিজের খেয়ে পরের (পুরাকীর্তি ও ইতিহাস) মোষ তাড়াতেন, যেমন মেহরাব আলী। তাছাড়া নিজেই যেহেতু মহকুমা অফিসার ও জেলা প্রশাসক ছিলেন সেহেতু সেগুলোর মালখানা, গ্রন্থাগার ও দলিল-দস্তাবেজের সাথে ঘটে গিয়েছিল নিবিড় সখ্য। সে থেকেই খেলাধুলোর পরিবর্তে তাঁর আকর্ষণ বাড়তে শুরু করেছিল পুরাকীর্তি, পুরনো পাণ্ডুলিপি প্রভৃতির দিকে।

আমলাদের চেয়ারে বসেই তিনি শুরু করেছিলেন বিষয়ভিত্তিক লেখিয়ের কাজ। সময় গড়িয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হয়। ততদিনে তিনি একই সাথে লেখিয়ের প্রস্তুতি পর্ব শেষ করে গবেষণা কাজে নিয়োজিত হন। জেলা ছেড়ে চলে আসেন কেন্দ্রে (ঢাকা)।

ছাত্রজীবনে অর্জিত ইংরেজি ও ফারসি ভাষার জ্ঞানের সাথে কর্মজীবনে মাঠে থাকা অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়ে একের পর এক পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করতে থাকেন তিনি। পুরাকীর্তির বিবরণ, নাথ সাহিত্য, ফারসি থেকে অনুবাদ ইত্যাদি ইত্যাদি। সে সুবাদে এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, ইতিহাস পরিষদ প্রভৃতি স্বনামধন্য কৃতবিদ্যগণের আড্ডাঘরগুলোর সাথেও গড়ে ওঠে তাঁর সখ্য। প্রকাশিত হতে থাকে একের পর এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ। শুধু তা-ই নয়, তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় দিনাজপুরে একটি পুরাতাত্ত্বিক জাদুঘর, সমাপিত হয় দিনাজপুরের সীতাকোট বিহারের প্রত্নোৎখনন। বিরল সব বিষয়। সরকারও তাঁকে যথাযথ স্থানে টেনে নিয়ে গেলো। তাঁকে পদায়ন করা হলো তদানীন্তন ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে। সেটিই ছিল তাঁর শেষ কর্মস্থল।

তিনি যখন সরকারি কর্মস্থলের কুরছি (কুরসি) ছেড়ে কলাবাগানে তাঁর ব্যক্তিগত বাসস্থানের দোতালার একটি ছোট কোঠায় বসে তাঁর গবেষণা কাজে নিয়োজিত, সে সময়েরই গল্প আজ আমি বিশেষ জোর দিয়ে বলছি। বলছি এ জন্য যে, তাঁর জীবন থেকে আমি একটি কথা শিখেছি, সেটি হলো- কীর্তিমান মানুষের জীবনে অবসর বলে কোনও শব্দ থাকে না। তাঁদের বেলায় এ কথা সত্য হয় না যে, 'পুড়িয়ে দিলাম; উড়ে গেলো। গেড়ে দিলাম, ধুলোয় মিশে গেলো।' তা যদি হতো তবে তো আজ আর এ লেখার প্রয়োজন হতো না। বার বার কেউ আমায় তাগিদ দিতো না যে, যাকারিয়া স্যারের স্মৃতিচারণ করবো; একটা লেখা দিন।

আমার কাছে জনাব যাকারিয়ার বিষয়ে কেন লেখা চায়? কারণ, সেই চুরাশি সালের দিনাজপুর ভ্রমণের সূত্র ধরে তাঁর সাথে আমার যে শিক্ষামূলক সখ্য সূচিত হয়েছিল তা আর কোনও দিন শিথিল হয়নি। তাঁর পুরাকীর্তি বিষয়ক লেখাগুলো পড়লেই বিষয়টি অনুধাবন করা যাবে। কারণে অকারণে তিনি তাঁর লেখার সাথে আমাকে জড়িয়ে রাখতেন। তিনি হয়ে ওঠেছিলেন বৃক্ষ। আর আমাকে করে নিয়েছিলেন লতা। প্রথম দৃষ্টান্ত: দিনাজপুর থেকে ঢাকায় ফিরে এসে তিনি শিল্পকলা একাডেমির পত্রিকায় লিখলেন নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার জগদ্দল বিহার সম্পর্কিত একটি নিবন্ধ। আবার তাঁর শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ The Archaeological Heritage of Bangladesh। এ দুই গ্রন্থের সম্পাদনার দায়িত্বও বর্তিয়েছিলেন আমার উপর।

সে যাই হোক, আ.কা.মো. যাকারিয়া শেষ অবধি অর্জন করেছিলেন একুশে পদক। তাছাড়া বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের সভাপতি, বাংলা একাডেমির ফেলোশিপ পদগুলোও অলংকৃত করেছিলেন। ছিলেন একাধারে খেলোয়াড়, ভাষ্যকার, শিক্ষক, আমলা, গবেষক, নিবন্ধক, সংগ্রাহক, অনুবাদক, জাদুঘর প্রতিষ্ঠাতা ও পুরাতাত্ত্বিক। তিনি উপন্যাসও লিখেছিলেন (অপ্রকাশিত)। তিনি একজন সুবক্তাও ছিলেন। ছিলেন বিনয়ী। ভাল পিতা। ভাল বন্ধু। সহজে কাউকে না বলতে পারতেন না। অদ্ভুত স্মরণ শক্তিও ছিল।

কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে মৃত্যু চলে এলো। আমাদের সাধ্য ছিল না সেটিকে ঠেকিয়ে রাখার। নিয়ে গেলো তাঁকে। তবু তিনি বিজয়ী। কারণ, মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে তিনি রেখে গেছেন কিছু প্রকাশনা। সেগুলোর আবেদন আজও পাঠকবর্গ, শিক্ষার্থী ও গবেষকগণের মাঝে ছড়িয়ে আছে। মৃত্যু তা কেড়ে নিতে পারেনি, পারবেও না।

লেখক: প্রত্নতত্ত্ববিদ

"পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ ..."

ডাঃ যাকিয়া মাহফুজা যাকারিয়া

প-বর্গের তৃতীয় বর্ণ দিয়ে গঠিত দুই বর্ণের একটি শব্দ 'বাবা'। এই বর্ণ দুটি পাশাপাশি বসিয়ে যে শব্দটি তৈরি হয়, তার মধ্যে যে মায়া আছে সে রকম পৃথিবীর কয়টি শব্দের মাঝে আছে তা বোধ করি হাতে গোনা যায়। বাবার অনেক প্রতিশব্দ আছে, তার মধ্যে পোশাকি শব্দটি 'পিতা'। পিতার আভিধানিক অর্থ জনক, যিনি জন্ম দিয়েছেন।

আমরা জানি, সংস্কৃত শ্লোকে আছে "পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ ... পিতহি পরম তপয়েস্যু" এ কথাটি আমার পিতার ক্ষেত্রে এতখানি খাটে যে তা অতি আশ্চর্যজনক। পিতা যেমনই হোন, তিনিই ধর্ম, তাঁর মাঝেই স্বর্গলাভ এবং তিনিই তপস্যাযোগ্য। অর্থাৎ তিনিই সন্তানের আদর্শ। অন্য কারো পিতা সম্পর্কে জানিনা, কিন্তু আমাদের পিতা আসলেই ছিলেন আদর্শ মানুষ, যিনি তপস্যার যোগ্য শুধু নন, বরং বলবো অনেক তপস্যা করলেই বুঝি এমন পিতার সন্তান হওয়া যায়।

আমার পিতাকে আমার মনে হয় এক মহীরুহের মত– বিশাল তার বিস্তৃত, অনেক গভীরতায় প্রোথিত তার শেকড়, আর অগণিত তাঁর উর্ধ্বগামী শাখা প্রশাখা ও শরীর থেকে নেমে যাওয়া ঝুরির সংখ্যা, যা দিয়ে শুধু তিনি নিজের অবস্থানকেই সংহত করেননি, নিজেকে করেছেন আরও অনেক মানুষের আশ্রয়স্থল।

যতদিন এই মহীরুহের তলায় ছিলাম, সন্তান হয়ে তার ব্যাপকতা, বিশালতা, বিস্তৃতি, গভীরতা ও প্রজ্ঞার পরিমাপ করতে পারিনি আদৌ। বলা যায়, তাঁকে জেনেছি শুধু নিজের ও নিজেদের অভিভাবক ও পিতা হিসাবেই। গুণমুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু পরিবারের ব্যাপ্তি ছাড়িয়ে তার গুণমুগ্ধতার ব্যাপকতা আরও কত বিশাল পরিধিযুক্ত তা অনুমান করতে পারিনি কখনও।

লেখাপড়া, বই ও জ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহ দেখেছি শিশুকাল থেকেই। সেখান থেকে শেখার চেষ্টা করেছি, বই পড়ার প্রতি আগ্রহের মত গুণটি মূলত বাবার কাছে থেকেই পাওয়া সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু বই পড়া নয়, বইয়ের মত বই পড়া এবং জ্ঞানের প্রতি যে সুগভীর আকর্ষণ তাঁর মধ্যে ছিল তা যে উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি এমন দাবি করতে পারবো না।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ। শুধু নিয়মের প্রতিই নয়, কাজের প্রতিও ছিল তাঁর প্রচুর অনুরাগ ও নিষ্ঠা। তিনি যে কাজগুলো করতেন সেগুলোর প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভালোবাসা। জন্মের পর জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই তাঁকে বিনা কাজে থাকতে কখনো দেখিনি। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তিনি কাজ করে যেতেন। নিজের কাজে অলসতা কখনো তাকে কাবু করতো না।

সবচেয়ে বড় কথা হল, এই কাজগুলো করতেন তিনি নেহায়েতই নিজের আনন্দে, যশখ্যাতি মান

সম্মানের জন্য নয়; অর্থ সম্পদের মোহে তো নয়ই। শুধু কাজ করার আনন্দে কাজ করা, তাও যে সব গবেষণামূলক কাজ তিনি করেছেন সেগুলোর প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা নিয়ে এত গভীর অনুরাগ অন্তরে ধারণ করে সেগুলোকে দিনের পর দিন নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করার মত গুণ আর ক'জনার ভেতর আছে তা আমার জানা নেই।

নিজের কাজের প্রতিই যে শুধু তিনি অনুরাগী ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সন্তানবৎসল পিতাও। সন্তানদের সাথে সময় কাটানো ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় একটি কাজ। আমি ছিলাম তাঁর দ্বিতীয় সন্তান। এখানে একটি কথা বলে রাখি। আমার বাবা অশেষ গুণে গুণান্বিত হলেও, মানুষ হিসেবে তাঁরও কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল, যার মধ্যে একটি তখনকার আমলে ছিল একান্তই স্বাভাবিক।

সাধারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের রীতি অনুসারে স্বাভাবিকভাবেই সর্বদাই তিনি পুত্রসন্তানের অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু তার প্রথম সন্তান কন্যা। এই দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়ে আমার জন্মের সময়ে তিনি অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন যে সকল শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এবার তার ঘরে আসবে একটি পুত্র সন্তান।

শত্রুর মুখে ছাই পড়ার পরিবর্তে তার আশায় ছাই দিয়ে আমি জন্ম গ্রহণ করলাম। তিনি নিরাশ হয়েছিলেন। এটা অনেক পরে জানতে পেরেছি, জানতে পেরে আমার মনেও অনেক দিন পর্যন্ত অনেক দুঃখ ছিল কেন ছেলে হয়ে জন্মালাম না সে নিয়ে। কিন্তু আচার ব্যবহারে মেয়ে বলে তিনি আমাকে কখনও কম আদর করেছেন বা কোনোভাবে অবহেলা করেছেন তা শত্রুও বলতে পারবে না। বরং শিশুবেলায় আমি আদর ও মনোযোগ পেয়েছি অন্যান্য ভাইবোনের চেয়ে বেশি। তার একটি কারণ হয়তোবা আমার জন্মের সাত বছর পর আমার তৃতীয় বোনের জন্ম হয়। এই সাত বছর টানা আমি তাঁর স্নেহধন্য থাকতে পেরেছি, এটা আমার পরম সৌভাগ্য।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর আমি এইচ.এস.সি পড়তে ঢাকা হলিক্রস কলেজের হোস্টেলে চলে আসি। তার আগ পর্যন্ত আমি লেখাপড়া ও তার বাইরের অনেক কর্মকাণ্ডে তাঁর সহযোগিতা পেয়েছি অপরিমেয়। যেমন একটি রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবো, আমি ভেবে পাচ্ছিনা কিভাবে লিখবো, আব্বা একনিঃশ্বাসে সমস্ত পয়েন্টসহ সংক্ষেপে বলে দিতেন, "এভাবে লিখবি।" আমি বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে যখন রচনাটি শেষ করে আব্বার হাতে দিতাম, তিনিও বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে যাওয়ার ভাব করতেন– বলতেন 'বাহ, চমৎকার লিখেছিস তো।'

ইংরেজি ভাষার উপর ছিল তাঁর অসাধারণ দখল। তাঁর কাছেই আমি অত্যন্ত কম বয়সে Tense শিখি। কিভাবে শিখি, তা-ও মনে আছে। তিনি ঘুমাচ্ছিলেন, রাত জেগে কাজ করার অভ্যাস ছিল বলে খুব সকালে উঠতে পারতেন না। আমি তখন প্রথম Tense বিষয়টি পড়ছি। তখনকার আমলে গৃহশিক্ষকের চল ছিল না। বুঝতে না পারায় আব্বাকে ঘুমন্ত অবস্থাতেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'আব্বা এটা একটু বুঝিয়ে দিন।'

আব্বা ঘুমের ঘোরে ঘোরেই Tense-এর শ্রেণীবিভাগ, সংজ্ঞা ও তার প্রতিটির উদাহরণ বলে গেলেন। আমিও বুঝে গেলাম। সেই যে শিখলাম, সেটাই মাথায় রয়ে গেছে আজীবন।

শুধু সাহিত্যেই নয়, সাহিত্যের ছাত্র হয়েও গণিতশাস্ত্রেও ছিল তার অসামান্য দখল। জ্যামিতির এক্সট্রাগুলো করতেও আব্বা সাহায্য করতে পারতেন অবলীলায় এবং পাটি গণিতের জটিল অংকগুলোও অনেক সময়ই তাঁর সাহায্যে সমাধান করতে হত। অথচ তিনি সাইন্সের ছাত্র ছিলেন না। অঙ্ক করেছেন কেবল ম্যাট্রিক পর্যন্ত। এত মেধা দিয়ে তাঁকে সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন যে তার পরিমাপ করা আমার সাধ্য নয়। অথচ সে মেধার কতটুকুই যথার্থ কাজে ব্যয় করতে পেরেছিলেন, আর যতটুকু পেরেছিলেন তার কতটুকুইবা মূল্যায়িত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়।

তিনি একনাগাড়ে পাঁচ বছর তেজগাঁও বিজি প্রেসের দায়িত্বে ছিলেন, শুনেছি তিনি দায়িত্ব নেওয়ার আগে বিজি প্রেসে প্রচুর দুর্নীতি ঘটছিল। সে সব দুর্নীতির অবসান ঘটানোর জন্য তৎকালীন সরকার প্রধানের দপ্তরে আব্বার নাম সৎ ও নীতিবান আমলা হিসেবে উল্লিখিত হওয়ায় তাঁকে সেখানকার প্রধান দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল- বিজি প্রেসে তাঁর নিয়োগের নেপথ্যকাহিনী আমরা জানতে পারি তাঁর জীবনের শেষভাগে তাঁরই মুখে কোনও এক ইন্টারভিউয়ে এক প্রশ্নকর্তার জবাব হিসেবে। অথচ যতদিন তিনি ওখানে কাজ করেছেন বা তার পরে কত দীর্ঘ সময় কেটে গেছে (ওখানে তিনি কাজে যোগ দিয়েছিলেন সম্ভবতঃ ১৯৬১ সালে এবং ওখান থেকে অন্যত্র বদলি হয়েছেন ১৯৬৬ সালে), কখনও তাঁর মুখ থেকে এই তথ্যটি আমরা জানতে পারিনি।

তখন ওখানে ওই পদে অধিষ্ঠিত আমলার জন্য কোনও উপযুক্ত বাসভবন ছিল না। কিন্তু বিজি প্রেসের ঠিক পাশেই সেটা নির্মাণাধীন ছিল। কিছুদিন আমরা ছোট একটি দোতলা বাসায় কাটাবার পর দুই বিঘা জমির ওপর নির্মিত ছবির মত সেই সুন্দর বাড়িটিতে সপরিবারে উঠে আসি। সুখের বিষয়, ততদিনে আমার ছোট বোন অর্থাৎ তৃতীয় বোনের পর আব্বার মনে অমিত সুখের সঞ্চার করে আমাদের সংসারে একজন ভ্রাতার আগমন ঘটেছে।

সেই সুন্দর বাসগৃহটিতে আমরা যখন উঠে এলাম, তখন বাড়িটির সামনের এক বিঘা ও পেছনের এক বিঘা ছিল কেবল বিরান মাটি, কাঁকরে কাঁকরে ভরা।

মনে আছে, প্রতিদিন অফিস থেকে এসে আব্বা মালির সাথে নিজ হাতে বাগানে কাজ করতেন, আমিও ছিলাম এ ব্যাপারে অত্যন্ত সক্রিয়। একটি ঘাসও ছিল না বাড়ির চারপাশে। নিজ হাতে ঘাস পর্যন্ত বুনেছি আমরা। তারপর সেখানে কত উৎসাহে পানি দিয়েছি যখনই অবসর পেয়েছি তখনই, যেন একটি ঘাসও মারা না যায়।

আমাদের বেডরুমের পাশেই লাগানো হয়েছিল একটি গন্ধরাজ ফুলগাছ। যে ফুলের সৌরভ প্রতিরাতে আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে যে আনন্দ দিত সে আনন্দের স্মৃতি আজও অম্লান, অক্ষত।

সে বাড়ির সামনের একপাশে আব্বা গড়ে তোলেন সুন্দর, পরিকল্পিত এক ফুলের বাগান, পেছন ভাগের আরেকটি দিকে সবজি ক্ষেত ও গরু পালনের জায়গা। অফিস থেকে আসবার পর আমার নিত্যকার রুটিন ছিল আব্বার সাথে বাগানে ঘোরা। তিনি নিজে আমাকে ডেকে নিতেন এবং অত্যন্ত উৎসাহের সাথে প্রতিটি গাছ, ফুল, ফল-সেগুলোর চাষ, জীবন সবকিছু সম্পর্কে বলতেন, বলতেন তাঁর ছেলেবেলাকার কথা, তাঁর জীবন দর্শন– আরও কতকিছু!

মনে পড়ে সেই সময়টাতেই আমি আব্বার জীবনদর্শন সম্পর্কে যেটুকু জানতে পারি তা দিয়ে আমার নিজের জীবনদর্শন গড়ে তোলার চেষ্টা করি। ওই সময় আমার বয়স ছিল ১০-১১ থেকে

১৩-১৪ বছর। ওই সময়টায় আব্বা যা কিছু বলেছেন পরবর্তী জীবনে আমার জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে তা অনেকখানিই প্রভাব বিস্তার করেছিল।

তার নিত্যচিন্তাশীল মস্তিষ্ক সব সময়ই ছিল অত্যন্ত সক্রিয়। দেশের ভবিষ্যত নিয়ে তাঁর ধ্যান ধারণা ছিল সব সময়ই অত্যন্ত প্রগতিশীল। গরীব দেশ হিসেবে তদানিন্তন পূর্বপাকিস্তানের জনগণের ভবিষ্যত নিয়েও অনেক চিন্তাভাবনা করতেন। কোনও এক পর্যায়ে তাঁর মনে হয়েছিল, হয়ত কমিউনিজমের মাধ্যমেই দেশের গরীব জনসমষ্টির ভাগ্যোন্নয়ন ঘটা সম্ভব।

তিনি প্রায়ই আমাকে এ কথাটি বলতেন। স্বাভাবিকভাবেই আমি কমিউনিজম সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতাম না। তাই এ ব্যাপারে জানতে চাওয়াতে তিনি সংক্ষিপ্তভাবে কমিউনিজম সম্পর্কে যা বলেছিলেন তাতে আমি প্রাথমিকভাবে বেশ ভীত হয়ে পড়েছিলাম।

গরীব ধনীর কোনোই পার্থক্য থাকবে না, সবাই একরকমভাবে থাকবে-এ কেমন কথা? আমার হতাশা দেখে সান্ত্বনা দিয়ে এক পর্যায়ে তিনি বললেন 'তুই ডাক্তারি পড়বি, তাহলে যেমন সমাজ ব্যবস্থাই হোক, তোর অসুবিধা হবে না।' সেই যে কথাটি আমার মাথায় ঢুকে গেল, আর বেরুল না, অবশেষে ডাক্তারই হলাম। যদিও অল্প কিছুদিন পরে তিনি নিজেই একসময় মত বদলিয়ে আমাকে ক্লাস নাইনে উঠবার পর আর্টসে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন আমার মতের সম্পূর্ণ বিপক্ষে, (তখন বোধ করি আমাকে নিয়ে তাঁর অন্য কোনও অভিলাষ কাজ করছিলো) কিন্তু নানা বিজ্ঞজনের পরামর্শে আবার আমাকে বিজ্ঞানেই ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

জীবনের এই শেষ প্রান্তে এসে মনে হয়, যদি তখন আব্বার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর্টস থেকে আবার সাইন্সে না আসতাম, সাহিত্য নিয়ে পড়তাম, তাহলে কি আমার বাবার আদর্শছায়ায় নিজের জীবনটাকে অন্যখাতে বইয়ে নেয়া সম্ভব হত? নিজেকে দেখতে পেতাম দেশবরেণ্য বাবার একটি ক্ষুদ্র প্রতিভাস হিসেবে?

জানি না, জানার উপায়ও নেই। তবে যে পথেই চলি, যে পেশাতেই থাকি তাঁর আদর্শকে শিরোধার্য করে যেন চলতে পারি জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এটিই আমার কামনা।

লেখক: শিল্পী ও লেখক

শিকড়সন্ধানী যাকারিয়া: জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য

ড. নীরু শামসুন্নাহার

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী,
ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে...

বাংলাদেশের হারিয়ে যাওয়া প্রত্নাবশেষ উদ্ধার প্রয়াসের অনন্য সাধারণ অগ্রপথিক, বাংলা মায়ের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস উদ্ধার-অনুসন্ধানে ব্রতী একনিষ্ঠ সাধকের নাম আ কা মো যাকারিয়া।

প্রত্নাবশেষ খুঁড়ে খুঁড়ে আপন ইতিহাসকে, সত্য আর সুন্দরকে রক্ষার জন্য কী প্রচণ্ড ব্যাকুলতা সব সময় উপচে পড়তো তাঁর গভীর, উজ্জ্বল দু'টি চোখ থেকে। আজীবন তিনি তাঁর অন্তর্গত চেতনাকে তাঁর সত্যানুসন্ধানী লেখনীর মধ্য দিয়ে উত্তরণের পথে প্রবাহিত করতে চেয়েছেন। শিকড়ের প্রতি তাঁর গভীর টান থেকেই এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন তিনি। সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা জয় করে পথ চলার খেলোয়াড়সুলভ সহজাত সাহসিকতা ছিল তাঁর স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর সাহসী ভূমিকা সে কথাই প্রমাণ করে। তিনি সে সময় 'চট্টগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অথরিটি'র চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

গুরুত্বপূর্ণ পদে অবস্থান করার সুবাদে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রায় শেষ পর্যন্ত প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে শহরে অবস্থান করে অদম্য এই দেশপ্রেমিক মানুষটি গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের মতো কৌশল অবলম্বন করে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, খাদ্য ও আশ্রয় প্রদান করেন। পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকার-আলবদরদের হত্যা তালিকায় তাঁর নাম থাকায় যুদ্ধের একেবারে শেষের দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের নির্দেশনায় শহর ছেড়ে এক বন্ধুর গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পরে ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে কাজ করেন তিনি। তাঁর মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে রচনা করে গেছেন 'মুক্তিযোদ্ধা, রাজাকার ও একজন তরুণী' নামের উপন্যাস।

জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। তবে বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় তাঁর ভূমিকা পথিকৃতের। এ বিষয়ে তাঁর রচিত 'বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ' গ্রন্থটি প্রত্নতত্ত্বের ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে সকলের কাছে এক আকর গ্রন্থ। বাংলাদেশে যারা প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে চর্চা করছেন, গবেষণা করছেন তাদের জন্য এই গ্রন্থ অতি অবশ্য পাঠ্য। আজ অবধি এই গ্রন্থে যাকারিয়া প্রদর্শিত এবং বিশ্লেষিত প্রত্নস্থানসমূহ উৎখনন করেই তাঁর অনুসারী প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরতে পেরেছেন।

মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস সংবলিত ফারসি ভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থ, মধ্যযুগে প্রচলিত বাংলা ভাষায় রচিত পুঁথিসাহিত্য আধুনিক বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা তাঁর অন্যতম মৌলিক কাজ

হিসেবে বিবেচিত হয়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো নাথ সাহিত্যের অন্যতম গ্রন্থ- 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস'। ইতিহাসবিদ যাকারিয়া, নাথ সাহিত্য রচনায় একাধিক মুসলিম কবির অবদান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেছেন। তিনি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, বৌদ্ধ, হিন্দু ও সহজিয়া (লোকায়ত) জনমানসের আধ্যাত্মিক চেতনার মিলনে-মিশ্রণে দশম-একাদশ শতকে নাথ ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ এবং ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে এটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করে। তিনি যদি এসব গ্রন্থের কোনটাই রচনা না করতেন, তাহলে তাঁর 'বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ' গ্রন্থটিই তাঁকে বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব চর্চার জনক হিসেবে বহুবছর বাঁচিয়ে রাখতো। তিনি নিজেই তাঁর প্রত্নতত্ত্ব চর্চার গুরু হিসেবে "ঢাকা জাদুঘর" এর প্রতিষ্ঠাতা কিউরেটর ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর নাম এবং এরপরেই ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায়ের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে জানা যায়, তিনি প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস চর্চায় নলিনীকান্ত ভট্টশালীর গভীর সান্নিধ্য লাভ করেন।

মৌলিক গ্রন্থ, মূল ফারসি থেকে অনূদিত গ্রন্থ, প্রাচীন পুঁথি সাহিত্য থেকে আধুনিক বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত গ্রন্থ ও বেশ কিছু অপ্রকাশিত উপন্যাস. ছোটদের জন্য রচনা, জীবনী গ্রন্থ মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ৪০ এর অধিক। ১৯৫৮ সালে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে দিনাজপুরে যোগ দিয়েই প্রাচীন ইতিহাসের অনুরাগী যাকারিয়া পুরাকীর্তি সমৃদ্ধ দিনাজপুরের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তিনি এসব পুরাকীর্তি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য তৎকালীন সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে অনুরোধ জানান।

কিন্তু তৎকালীন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কোনরকম উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ১৯৬৭ সালে জেলা প্রশাসক হিসেবে দিনাজপুরে যোগদান করার ফলে এই অঞ্চলের প্রত্নসম্পদ রক্ষার জন্য তিনি তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করেন। ১৯৬৮ সালে সীতাকোট বিহার উৎখননের মধ্য দিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক হিসেবে তাঁর সুদীর্ঘ যাত্রার সূত্রপাত। এভাবেই শুরু হয় তাঁর পুরাকীর্তি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মতো দুরূহ এক প্রচেষ্টা। তাঁর একক প্রচেষ্টায় সংগৃহীত প্রচুর প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণের জন্য তিনি দিনাজপুরবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে ১৯৬৮ সালে 'দিনাজপুর জাদুঘর' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘরটি দেশের অন্যতম প্রত্নসম্পদ সমৃদ্ধ জাদুঘর হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রত্নতত্ত্ব গবেষকদের স্বীকৃতি পেয়েছে এবং প্রসঙ্গত, এটি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের একমাত্র ডিজিটালি সংরক্ষিত জাদুঘর। ইউনেসকো, ঢাকার সহায়তায় দিনাজপুর জাদুঘরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ ডিজিটাল সংরক্ষণে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. স্বাধীন সেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বেঁচে থাকার শেষ দিনটি পর্যন্ত দেশের মানুষের উন্নয়নে তাঁর মেধা এবং মননের সারাৎসার নিঃশেষে দান করে গেছেন এই কৃতবিদ্য মানুষটি। একাধারে একজন সৎ, দক্ষ প্রশাসক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদ হিসেবে তাঁর এই অসাধারণ কীর্তি তাঁকে বাংলাদেশের সরকারি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আইকনে পরিণত করেছে। ভাস্কর্য, আরবী-ফারসি শিলালিপির পাঠ উদ্ধার, প্রাচীন স্থাপত্য প্রভৃতির পর্যবেক্ষণ থেকে সঠিক উপায়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও অনুশীলনে আ কা মো যাকারিয়ার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অনুসন্ধান পদ্ধতি ও কর্মস্পৃহা 'ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি'র তরুণ গবেষকদের নিজেদের ইতিহাস অনুসন্ধান, গবেষণা ও সংরক্ষণে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করে তোলে। এভাবেই আমাদের তরুণ প্রজন্মের গবেষকদের জন্য প্রাজ্ঞ এই জ্ঞানতাপস অদম্য কর্মস্পৃহার এক অনন্য উদাহরণ হয়ে ওঠেন।

আলোকের দিশারী হয়ে দেশকে বিশ্ব-প্রাঙ্গণে কেমন করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তারই সাধনা আজীবন করে গেছেন নিভৃতচারী, নির্লোভ দেশপ্রেমিক এই মানুষটি। একজন গভীর সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে পণ্ডিত থেকে শুরু করে যে কোন সাধারণ মানুষের জন্য তিনি ছিলেন ছায়াদানকারী এক অক্ষয় বটবৃক্ষ। আমাদের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের প্রত্নাবশেষ উদ্ধার প্রয়াসের অনন্য সাধারণ অগ্রপথিক আ কা মো যাকারিয়া ২০১৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি মর্ত্যলোকের মায়া কাটিয়ে চলে যান সুতোর ওপারে, অন্য আরেক পৃথিবীতে। তাঁর চলে যাওয়া আমাদের অনিবার্য বিধিলিপি। মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্তও তাঁর প্রবল অভীপ্সা ছিল এ দেশের সমৃদ্ধ অতীতের স্মারকগুলিকে অবিকল বাঁচিয়ে রাখা। তাঁর গভীর দেশপ্রেম, ইতিহাস-চেতনা থেকে উৎসারিত রচনাগুলো শ্রেয় চেতনাসম্পন্ন মানুষদেরও বারবার নাড়া দেবে। অনন্ত নীলিমায় অন্তর্লীন যখন তিনি, তখনও তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাদের জীবনচর্যায়। জীবৎকালে যতখানি, তার চাইতে বেশি জীবন্ত তাঁর উপস্থিতি দিনে দিনে। তাঁর জীবনদায়িনী লেখাগুলোর পরম্পরা ধরে আমরা তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলো সফল সমাপ্তিতে নিয়ে যেতে পারলে তবেই হয়তো সম্ভব হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের আলোকময় অমল উদ্ধার। জন্মশতবর্ষে তাঁর অবদানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি –

" ... মানবিক পরমায়ু অতি দ্রুত শেষ হয়ে যায়–
একমাত্র আলোকের পক্ষেই সম্ভব অবাস্তব
সম্ভাবনা দৃশ্যমান ক'রে তোলা বস্তুর বাস্তবে।
আবরিত সত্যের ওপর সন্ধানী চোখের মতো
দিব্যজ্যোতি ফেলা হয়, -এমনকি', না'-এর ওপর
'হ্যাঁ'-এর আলোক রশ্মি ফেলে বিশ্বাসের অবিশ্বাস্য
ভিত্তি গ'ড়ে তোলা অত্যন্ত সহজ হ'তে পারে, হয়।

আলোকের দিকে মুখ– নতজানু প্রার্থনায় রত
বিভিন্ন জীবন আজ, আয়ুময় অণু-পরমাণু॥"

('আলোকের গতিবিধি', 'রফিক আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা' কাব্যগ্রন্থ)

লেখক: গবেষক ও পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

কারো প্রতি কোনো অভিযোগ ছিল না আব্বার

সুফিয়া আতিয়া যাকারিয়া

আমি আমার বাবার চতুর্থ সন্তান এবং চতুর্থ কন্যা সন্তান। যদিও আমার আগের বোন অর্থাৎ আব্বার তৃতীয় কন্যা মাত্র ৩ মাসের আয়ু নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল।

আমার জন্মের ৩ বছর পর আমার প্রথম ভাইয়ের জন্ম হয়। চতুর্থ কন্যার জন্মের সংবাদ পেয়ে সে মুহূর্তে আব্বার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা সংগত কারণেই জানা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তবে বোধশক্তি হওয়ার পর থেকে তার কোন ছায়া আব্বার ব্যবহারে কোন দিনই পাইনি। অবিমিশ্র স্নেহ-ভালবাসার প্রতিফলনই দেখেছি। বরং কনিষ্ঠ কন্যা হওয়ার সুবাদে অন্যদের চেয়ে আলাদা স্নেহের সম্বোধনও পেয়েছি। তবে আব্বার ব্যবহারের মাধুর্যই ছিল এমন, হয়তো প্রত্যেকেরই মনে হতো তাকে আলাদা চোখে দেখা হচ্ছে। এ বোধটি পরিবারের বাইরেও অনেকের মধ্যেই রয়েছে।

খুব ছোট বেলায় আব্বার স্নেহ, মনোযোগ পেয়েছি। একটু বড় হওয়ার পর আব্বাকে ভয় পেতাম, কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল।

আব্বার সাথে আসল সখ্য গড়ে ওঠে সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে হসপিটালে দীর্ঘ আড়াই মাস আমার একেবারে শয্যাশায়ী থাকার সময়ে। স্বাভাবিকভাবেই আব্বা প্রতিদিন হাসপাতালে আসতেন, মাথার কাছে বসে থাকতেন, কি খেতে ইচ্ছে করে জানতে চাইতেন।

খাওয়ার প্রশ্নে খুব বিরক্তি প্রকাশ করতাম কারণ তখন আমার কিছুই খেতে ইচ্ছে করতো না। কিন্তু ধীরে ধীরে একটা সময়ে আবিষ্কার করলাম, হাসপাতালের বেডে শুয়ে আব্বার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আব্বা পাশে বসে থাকলে ভাল লাগছে। এভাবে তৈরি হলো নৈকট্য। তারপর পুরোপুরি সুস্থ হওয়া পর্যন্ত সরাসরি আব্বার তত্ত্বাবধানে ছিলাম, সেদিনগুলো কোনো দিনই ভুলব না।

মাঝখানে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। আমি সুস্থ হয়েছি। লেখাপড়া শেষ করেছি। সরকারি চাকরিতে যোগদান করেছি। সংসার জীবনে প্রবেশ করেছি- অনেক ঘটনা।

আবার আব্বার সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হলো তিনি রোগশয্যায় থাকার সময়ে। আমাদের ছেড়ে চিরতরে চলে যাওয়ার আগে দীর্ঘ এক বছর হাসপাতালে থাকতে হয়েছে তাঁকে। সে সময়ে আব্বার সাথে একান্তে দিনের পর দিন অনেক সময় কাটিয়েছি। তখন আবার পুরনো আব্বাকে ফিরে পেয়েছিলাম। কম বয়সে যা অনুধাবন করতে পারিনি-পরিণত বয়সে এসে উপলব্ধি করেছি আব্বা কতখানি চাপা স্বভাবের ছিলেন। নিজের একান্ত আবেগ সযত্নে গোপনে রেখে দিতেন।

একা বয়ে বেড়াতেন নিজস্ব অনুভূতি, আনন্দ-বেদনার তীব্রতা!

রোগশয্যায় থাকা অবস্থায় লুকোনো আবেগের ছিটেফোঁটা প্রকাশ পেতো, বাকিটা আমি অনুভব করার চেষ্টা করেছি। সারাজীবন আব্বাকে নির্লিপ্ত দেখেই অভ্যস্ত ছিলাম। এখন মনে হয়, ভুল ভেবেছি, ভুল করেছি। আরেকটু এগিয়ে আব্বার মনের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করলে, আব্বার ইচ্ছেগুলো পূর্ণ করলে, আরো অনেক দিন আরো কাছাকাছি থাকতে পারতাম। আব্বার একান্ত নিজস্ব সুখ দুঃখগুলো অন্ততঃ মনে মনে ভাগ করে নেয়ার চেষ্টা করতাম।

আব্বার কোনো ইচ্ছেই আমি পূরণ করিনি বলা যায়। যেমন, আব্বার অধীত বিষয় ইংরেজি আমার বিষয় হিসেবেও বেছে নিই তা চেয়েছিলেন, আমি নিইনি। তাঁর মত প্রশাসন ক্যাডারে চাকরি করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিই তাও চেয়েছিলেন, আমি পরীক্ষা দিইনি! এখন বড্ড আফসোস হয়। তাহলে একদিকে আমার জীবনটাও হয়তো অন্য খাতে বইত, অন্যদিকে আব্বার শখও পূরণ করা হত।

আব্বার শৈশব-কৈশোর কেটেছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। পড়াশোনা করেছেন অত্যন্ত কষ্ট করে। এই সময় পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকায় বাড়ি থেকে কোনো সাহায্য পেতেন না। বরং স্কুলটি মামার বাড়ির কাছাকাছি হওয়ায় সেখানে থেকে কিছুদিন লেখাপড়া করতে হয়েছে তাঁকে।

ছাত্র হিসেবে আব্বা ছিলেন তুখোড় মেধাবী। তাই তখনকার দিনে প্রত্যন্ত এলাকার একটি স্কুলে থেকেও ভাল ফলাফল করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন তিনি।

ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে মেধা তালিকায় দশম স্থান অধিকার করেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন পর্যন্ত আব্বা প্রাইভেট টিউশনির টাকা দিয়ে লেখাপড়ার খরচসহ নিজের যাবতীয় খরচ মেটাতেন। উপরন্তু বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মাকেও টাকা পাঠাতেন। এমনই সংগ্রামী জীবন ছিল তাঁর।

সারাজীবনই সংগ্রাম করে গেছেন আব্বা। প্রখর মেধার পাশাপাশি অত্যন্ত পরিশ্রমীও ছিলেন তিনি। পদমর্যাদার কারণে বিভিন্ন সরকারি গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন, সাথে নিরলসভাবে জ্ঞান চর্চা করে গেছেন। তাঁর এই অধ্যাবসায়, পরিশ্রম, ধীশক্তি কোনোটিই নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারিনি।

কিন্তু কষ্ট হয় এই ভেবে যে, তিনি তাঁর অবদানের স্বীকৃতি পুরোপুরি পাননি। প্রচারবিমুখ হওয়ার কারণে তাঁর কাজের গুরুত্ব সেভাবে প্রকাশিত হয়নি। সে আক্ষেপ রোগশয্যায় শুয়ে তাঁকে করতে শুনেছি। আগেই বলেছি, জীবনের শেষ দিনগুলোতে তাঁর মনের গভীরে লুকানো কিছু কথা প্রকাশ পেয়ে যেতো। কিন্তু নির্বাক হয়ে শোনা ছাড়া আমার কিছুই করার ছিল না। ২০১৫ সালে তিনি একুশে পদক পেয়েছেন বটে, কিন্তু সেটি পাওয়ার আনন্দ তিনি পুরোপুরি উপভোগ করতে পারেননি। পদক পাওয়ার কয়েক দিন পরই তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। অথচ এ স্বীকৃতিটি তাঁর অনেক আগেই পাওয়া উচিত ছিল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি বহু কাজ অসমাপ্ত রেখে গেছেন। আরও অনেক অসামান্য লেখা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। আমাদের প্রত্যেকেরই সাধ ছিল, আব্বা জন্ম শতবার্ষিকীর কেক নিজের হাতে কাটবেন।

আব্বার ছিল অপরিসীম সহ্যশক্তি। বিশেষ করে রোগশয্যায় শেষের ৩ মাস তিনি অসহ্য শ্বাসকষ্টে ভুগেছেন। অসহনীয় কষ্ট। কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে কোনো দিন আর্তনাদ শুনিনি। অনেক সময়েই

কারো প্রতি কোনো অভিযোগ ছিল না আব্বার

সুফিয়া আতিয়া যাকারিয়া

আমি আমার বাবার চতুর্থ সন্তান এবং চতুর্থ কন্যা সন্তান। যদিও আমার আগের বোন অর্থাৎ আব্বার তৃতীয় কন্যা মাত্র ৩ মাসের আয়ু নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল।

আমার জন্মের ৩ বছর পর আমার প্রথম ভাইয়ের জন্ম হয়। চতুর্থ কন্যার জন্মের সংবাদ পেয়ে সে মুহূর্তে আব্বার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা সংগত কারণেই জানা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তবে বোধশক্তি হওয়ার পর থেকে তার কোন ছায়া আব্বার ব্যবহারে কোন দিনই পাইনি। অবিমিশ্র স্নেহ-ভালবাসার প্রতিফলনই দেখেছি। বরং কনিষ্ঠ কন্যা হওয়ার সুবাদে অন্যদের চেয়ে আলাদা স্নেহের সম্বোধনও পেয়েছি। তবে আব্বার ব্যবহারের মাধুর্যই ছিল এমন, হয়তো প্রত্যেকেরই মনে হতো তাকে আলাদা চোখে দেখা হচ্ছে। এ বোধটি পরিবারের বাইরেও অনেকের মধ্যেই রয়েছে।

খুব ছোট বেলায় আব্বার স্নেহ, মনোযোগ পেয়েছি। একটু বড় হওয়ার পর আব্বাকে ভয় পেতাম, কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল।

আব্বার সাথে আসল সখ্য গড়ে ওঠে সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে হসপিটালে দীর্ঘ আড়াই মাস আমার একেবারে শয্যাশায়ী থাকার সময়ে। স্বাভাবিকভাবেই আব্বা প্রতিদিন হাসপাতালে আসতেন, মাথার কাছে বসে থাকতেন, কি খেতে ইচ্ছে করে জানতে চাইতেন।

খাওয়ার প্রশ্নে খুব বিরক্তি প্রকাশ করতাম কারণ তখন আমার কিছুই খেতে ইচ্ছে করতো না। কিন্তু ধীরে ধীরে একটা সময়ে আবিষ্কার করলাম, হাসপাতালের বেডে শুয়ে আব্বার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আব্বা পাশে বসে থাকলে ভাল লাগছে। এভাবে তৈরি হলো নৈকট্য। তারপর পুরোপুরি সুস্থ হওয়া পর্যন্ত সরাসরি আব্বার তত্ত্বাবধানে ছিলাম, সেদিনগুলো কোনো দিনই ভুলব না।

মাঝখানে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। আমি সুস্থ হয়েছি। লেখাপড়া শেষ করেছি। সরকারি চাকরিতে যোগদান করেছি। সংসার জীবনে প্রবেশ করেছি- অনেক ঘটনা।

আবার আব্বার সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হলো তিনি রোগশয্যায় থাকার সময়ে। আমাদের ছেড়ে চিরতরে চলে যাওয়ার আগে দীর্ঘ এক বছর হাসপাতালে থাকতে হয়েছে তাঁকে। সে সময়ে আব্বার সাথে একান্তে দিনের পর দিন অনেক সময় কাটিয়েছি। তখন আবার পুরনো আব্বাকে ফিরে পেয়েছিলাম। কম বয়সে যা অনুধাবন করতে পারিনি-পরিণত বয়সে এসে উপলব্ধি করেছি আব্বা কতখানি চাপা স্বভাবের ছিলেন। নিজের একান্ত আবেগ সযত্নে গোপনে রেখে দিতেন।

একা বয়ে বেড়াতেন নিজস্ব অনুভূতি, আনন্দ-বেদনার তীব্রতা!

রোগশয্যায় থাকা অবস্থায় লুকোনো আবেগের ছিটেফোঁটা প্রকাশ পেতো, বাকিটা আমি অনুভব করার চেষ্টা করেছি। সারাজীবন আব্বাকে নির্লিপ্ত দেখেই অভ্যস্ত ছিলাম। এখন মনে হয়, ভুল ভেবেছি, ভুল করেছি। আরেকটু এগিয়ে আব্বার মনের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করলে, আব্বার ইচ্ছেগুলো পূর্ণ করলে, আরো অনেক দিন আরো কাছাকাছি থাকতে পারতাম। আব্বার একান্ত নিজস্ব সুখ দুঃখগুলো অন্ততঃ মনে মনে ভাগ করে নেয়ার চেষ্টা করতাম।

আব্বার কোনো ইচ্ছেই আমি পূরণ করিনি বলা যায়। যেমন, আব্বার অধীত বিষয় ইংরেজি আমার বিষয় হিসেবেও বেছে নিই তা চেয়েছিলেন, আমি নিইনি। তাঁর মত প্রশাসন ক্যাডারে চাকরি করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিই তাও চেয়েছিলেন, আমি পরীক্ষা দিইনি! এখন বড্ড আফসোস হয়। তাহলে একদিকে আমার জীবনটাও হয়তো অন্য খাতে বইত, অন্যদিকে আব্বার শখও পূরণ করা হত।

আব্বার শৈশব-কৈশোর কেটেছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। পড়াশোনা করেছেন অত্যন্ত কষ্ট করে। ওই সময় পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকায় বাড়ি থেকে কোনো সাহায্য পেতেন না। বরং স্কুলটি মামার বাড়ির কাছাকাছি হওয়ায় সেখানে থেকে কিছুদিন লেখাপড়া করতে হয়েছে তাঁকে।

ছাত্র হিসেবে আব্বা ছিলেন তুখোড় মেধাবী। তাই তখনকার দিনে প্রত্যন্ত এলাকার একটি স্কুলে থেকেও ভাল ফলাফল করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন তিনি।

ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে মেধা তালিকায় দশম স্থান অধিকার করেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন পর্যন্ত আব্বা প্রাইভেট টিউশনির টাকা দিয়ে লেখাপড়ার খরচসহ নিজের যাবতীয় খরচ মেটাতেন। উপরন্তু বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মাকেও টাকা পাঠাতেন। এমনই সংগ্রামী জীবন ছিল তাঁর।

সারাজীবনই সংগ্রাম করে গেছেন আব্বা। প্রখর মেধার পাশাপাশি অত্যন্ত পরিশ্রমীও ছিলেন তিনি। পদমর্যাদার কারণে বিভিন্ন সরকারি গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন, সাথে নিরলসভাবে জ্ঞান চর্চা করে গেছেন। তাঁর এই অধ্যাবসায়, পরিশ্রম, ধীশক্তি কোনোটিই নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারিনি।

কিন্তু কষ্ট হয় এই ভেবে যে, তিনি তাঁর অবদানের স্বীকৃতি পুরোপুরি পাননি। প্রচারবিমুখ হওয়ার কারণে তাঁর কাজের গুরুত্ব সেভাবে প্রকাশিত হয়নি। সে আক্ষেপ রোগশয্যায় শুয়ে তাঁকে করতে শুনেছি। আগেই বলেছি, জীবনের শেষ দিনগুলোতে তাঁর মনের গভীরে লুকানো কিছু কথা প্রকাশ পেয়ে যেতো। কিন্তু নির্বাক হয়ে শোনা ছাড়া আমার কিছুই করার ছিল না। ২০১৫ সালে তিনি একুশে পদক পেয়েছেন বটে, কিন্তু সেটি পাওয়ার আনন্দ তিনি পুরোপুরি উপভোগ করতে পারেননি। পদক পাওয়ার কয়েক দিন পরই তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। অথচ এ স্বীকৃতিটি তাঁর অনেক আগেই পাওয়া উচিত ছিল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি বহু কাজ অসমাপ্ত রেখে গেছেন। আরও অনেক অসামান্য লেখা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। আমাদের প্রত্যেকেরই সাধ ছিল, আব্বা জন্ম শতবার্ষিকীর কেক নিজের হাতে কাটবেন।

আব্বার ছিল অপরিসীম সহ্যশক্তি। বিশেষ করে রোগশয্যায় শেষের ৩ মাস তিনি অসহ্য শ্বাসকষ্টে ভুগেছেন। অসহনীয় কষ্ট। কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে কোনো দিন আর্তনাদ শুনিনি। অনেক সময়েই

তন্দ্রার ঘোরে অথবা রোগ যন্ত্রণার কারণে তিনি চোখ বন্ধ করে নিশ্চুপ শুয়ে থাকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আমি মাথার পাশে বসে থেকেছি। মাঝে মাঝে চোখ খুলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখতেন। আবার চোখ বন্ধ করে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন।

অনেক রাতে যখন ঘরে ফেরার জন্য উঠে আসতাম, যদি সচেতন থাকতেন, তখন কখনো পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখতাম, তিনি ঘাড় ফিরিয়ে একদৃষ্টে দরজার দিকে চেয়ে আমার চলে যাওয়া দেখছেন। প্রতি রাতে তাঁকে হাসপাতালে রেখে আমাদের চলে যাওয়া তাঁকে অবশ্যই কষ্ট দিত, কিন্তু মুখে কখনো কোনো অভিযোগ করতেন না। কারো প্রতি কোনো অভিযোগ ছিল না। তাঁর নীরব সেই অভিব্যক্তি, তাঁর ঘাড় ঘুরিয়ে সেই তাকানো আজও আমি আমার মনের মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছি।

তিনি যেখানে থাকুন, যেভাবেই থাকুন আল্লাহ তা'আলা যেনো তাঁর আত্মাকে শান্তিতে রাখেন-সৃষ্টিকর্তার কাছে নিরন্তর এই প্রার্থনা। পৃথিবীতে তিনি খুব শান্তি পাননি-পরলোকে যেনো তিনি তা পান। রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা'ইয়ানি সাগিরা।

লেখক: মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

এক অনন্য মানুষ ছিলেন আমার বাবা

মারুফ শমশের যাকারিয়া

সবার কাছেই সবার বাবা খুব প্রিয়, সবচেয়ে ভাল বাবা। আমারও তাই। তারপরও আমার বাবা একটু বেশী ভাল, আমার কাছে, আমার সব ভাই-বোনদের কাছেও। কারণ আব্বা ছিলেন সত্যি এক অনন্য মানুষ। এমন মানুষের জন্ম খুব কমই হয়। কর্ম জীবনে সফল ও অত্যন্ত জনপ্রিয় আমলা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাসবিদ হিসেবে গবেষণায় কিংবদন্তি হিসেবে খ্যাতি নিয়েও পরিবারের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত ত্যাগী ও স্নেহপরায়ণ। তাই ৯৭ বছর বয়সে আব্বা যখন চলে গেলেন, তখন মনে হয়েছিল, এতো তাড়াতাড়ি কেন গেলেন! আরো তো অনেক দিন বেঁচে থাকা দরকার ছিল আমাদের জন্য।

আব্বা সর্বজন স্বীকৃত অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। তাঁর জ্ঞান অর্জিত হয়েছে অধ্যবসায় ও তাঁর সহজাত প্রতিভা থেকে। আমার ছোটবেলায় তিনি আমাকে ইতিহাস, ধর্ম, জীবন সম্পর্কে এতো সুন্দর করে গল্প করতেন, যাতে আমার মন-মানসিকতা অত্যন্ত আধুনিক ছাঁচে গড়ে উঠেছে বলে আমি মনে করি। মানব সভ্যতার বিকাশ, সেটা ডারউইনের তত্ত্ব হোক অথবা আদম (আঃ) এর ঘটনা হোক, তিনি আমার শিশু মনে সুচারুভাবে প্রতিফলিত করেছিলেন, যা একটি শিশুকে গোঁড়ামি মুক্ত স্বাধীন চিন্তার অবকাশ করে দিয়েছিল।

প্রতি জন্মদিনে তিনি আমাদের বই উপহার দিতেন, বয়স অনুযায়ী পাঠযোগ্য। আব্বার সাথে গল্প করার মত আনন্দময় আর কিছু আমার ছোটবেলায় ছিলো না।

তিনি সবসময়ই সুযোগ পেলে সৎ থাকার উপদেশ দিতেন। তিনি মনে করিয়ে দিতেন দাদার বাণী। তিনি যখন সরকারি চাকরিতে যোগদান করতে যাচ্ছিলেন, দাদা তখন আব্বাকে সাবধান করে বলেছিলেন, 'বাবা যাই কর না কেন, হারাম কামাই কর না।' আব্বা যে তা কতো সার্থকভাবে পালন করেছিলেন তা তাঁর শত্রুরাও স্বীকার করবেন। আমার দেখা কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি।

আব্বা চট্টগ্রামে সিডিএ চেয়ারম্যান ছিলেন '৬৯-৭২ সাল পর্যন্ত। আমি তখন খুব ছোট, ৫/৬ বছর। এক নামি ঠিকাদার আমাদের পাহাড়ের নিচে গাড়ি রেখে হেঁটে হেঁটে উপরে এসে গেটের কাছে দণ্ডায়মান। অনুমতির অপেক্ষায়। আব্বার সরাসরি উত্তর 'আমি বাসায় অফিসের কাজ করি না। অফিসে দেখা করুন।'

আরও একটি ঘটনা, সেটা অবশ্য আব্বা চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরে, আমাদের কলাবাগানের বাসায়। আব্বা ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের মেম্বার ছিলেন বহু বছর। একটি সিনেমা ছবিকে দিয়েছিলেন হুবহু ভারতীয় সিনেমা নকলের অভিযোগে। চিত্রপরিচালক জানতে পারেন যে আমার বাবার কারণেই এটা সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পাচ্ছে না। তিনি সরাসরি বাসায় চলে এলেন। আব্বা তাকে একই কথা বললেন, 'আমি তো বাসায় অফিসের কাজ নিয়ে আলাপ করি না, আপনি বিশিষ্টজন, চা খান, আমার লেখা বইপত্র নাড়াচাড়া করেন, ব্যাস।'

আব্বা অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। যাকে মানুষ ভাল না বেসেই পারে না। তিনি অফিসের পিয়ন বাসায় এলে স্যার স্যার করে বলতেন। সবার সাথে খুব ভাল ব্যবহার করতেন। অত্যন্ত স্নেহ দিয়ে আমাদের বড় করেছেন। লেখাপড়ার তাগিদ ছাড়া কখনো আমাদের সাথে রাগ করতে দেখিনি। তিনি অন্যের মতের সাথে একমত না হলেও কখনো তর্কে যেতেন না। মনোযোগ দিয়ে অন্যের বক্তব্য শুনতেন। শেষ বয়সে তাঁকে নিয়ে যখন ডাক্তারের কাছে দৌড়াদৌড়ি করতাম, তিনি খুব লজ্জিত হয়ে বলতেন, 'বাবা, তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছি'। লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে যেতো।

তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। কর্মজীবনে আর পারিবারিক জীবনেও। আমাদের পরিবারে কিছু জটিলতা থাকলেও অনেক প্রতিকূল অবস্থায়ও তিনি ন্যায়ের পাল্লা এদিক ওদিক করেন নি। সত্য ও ন্যায় অধিষ্ঠিত রেখেছেন অনেক কষ্ট সহ্য করেও।

আমার বাবা সৃষ্টিশীল মানুষ ছিলেন। তাই তাঁর সন্তানদের মাঝেও তেমন কিছু খুঁজতেন। আমি তেমন কিছু হতে পারিনি। তবে আমার প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'নিগড়' যখন তাঁর হাতে তুলে দিলাম, তিনি বলেছিলেন, 'আমার সুযোগ্য তনয়'। আমি সেটা কখনো ভুলতে পারবো না। তিনি আমার উপন্যাসটা এতো পছন্দ করেছিলেন, আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম। সন্তান বাৎসল্য তো মানবীয় গুণই।

আব্বাকে নিয়ে লেখা ফেসবুক পোস্টগুলো কিছুটা পরিমার্জিত করে এখানে তুলে ধরলাম।

আব্বার অসুস্থ অবস্থায় বাসার ঘটনা

ছোটবেলায় আমার আব্বা আমাকে একটি মজার গল্প শুনিয়েছিলেন। বাড়ির কর্তা পরিবারের সবার সাথে রাগ করে খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। ওনার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, এমনকি কাজের লোক, সবার বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি খেলেন না। পরিবারের সদস্যরা তারপরেও চেষ্টা চালিয়ে গেল। কিন্তু তিনি অনড়। কিছুতেই খাবেন না। সবার থেকে মুখ ফিরিয়ে, দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে রইলেন।

এক পর্যায়ে সবাই রণে ভঙ্গ দিল। তিনি খাবেনই না মনে করে আর কেউ তাঁকে অনুরোধ করতে এলো না। এদিকে এতক্ষণ না খেয়ে থাকায় তাঁর ক্ষিধে ভালই জানান দিতে লাগলো। চক্ষুলজ্জার খাতিরে কাউকে বলতে পারছিলেন না যে তিনি এখন খেতে চান। মনে ক্ষীণ আশা ছিলো, কেউ হয়তো আবার তাঁকে খেতে অনুরোধ করবে। এবার তিনি নিমরাজি হয়ে খেয়ে ফেলবেন। কিন্তু কেউ এলো না।

তখন তিনি উপায়ন্তর না দেখে, যে দেয়ালকে সাক্ষী করে সমস্ত রাগ নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছিলেন, সেই দেয়ালেই লিখে ফেললেন, 'আরেক বার সাধিলেই খাইবো'।

গল্পটি বলে আমাদের সাথে আব্বা নিজেও অনেক হেসেছিলেন। আজ থেকে অন্তত পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কথা। ঠিক মনে নেই, আমি না আমার অন্য কোনো ভাইবোন, কে রাগ করে খেতে না চাওয়ায় তিনি এই গল্পটি বলেছিলেন।

History repeats itself. আজ আমি আব্বাকে সেই গল্পটি মনে করিয়ে দিলাম। গল্পটি বলার পর দুজনেই হো হো করে হাসলাম, ঠিক পঁয়তাল্লিশ বছর আগে যেভাবে হেসেছিলাম। আমি আরো বললাম, 'আব্বা একটা চক বা পেন্সিল কি দেবো? দেয়ালে লেখার জন্য'। তিনি আরো হাসলেন। মনটা ভরে গেল।

সেদিন আমি ছিলাম পাঁচ বছরের শিশু, আর আব্বা পঞ্চাশ। আজ আমি ৫০+ আর তিনি ৯৬+।

শারীরিক অসুস্থতা ও বার্ধক্যজনিত কারণে কিছুটা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। বিকেলে অফিস থেকে ফেরার পথে আম্মার ফোনে জানলাম যে, আব্বা আজ সকাল থেকে কিছুই খাচ্ছেন না। সবার সাথে রাগারাগি করছেন। গতকালই তাঁকে হাসপাতাল থেকে আনা হয়েছে। তাই গিয়েছিলাম counseling করতে। আমার জরুরি কাজ থাকায় চলে আসতে হয়েছিলো। জানা হয়নি পরে তিনি খেয়েছিলেন কিনা। তবে গল্পটি আব্বাকে বলে মনে হলো ইতিহাসের চাকা যেনো উলটো দিকে ঘুরে গেলো। আজ আমি পিতা, আর আব্বা পাঁচ বছরের শিশু!

আব্বার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে গ্রামে

আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা ঢাকায়। কেউ দেশের বাড়ি কোথায় প্রশ্ন করলে বলতাম, 'আমার দাদা বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া।'
সাথে সাথে ফিরতি প্রশ্ন আসে, 'আপনার দেশ না?'

আমি বলতাম, '৫০%। কারণ আমার নানাবাড়ি শেরপুর। আমি ঢাকায়ই বড় হয়েছি। আমার দেশ আসলে বাংলাদেশ। আমাকে কোন আঞ্চলিকতায় সীমাবদ্ধ করতে চাই না।'
আমার উত্তর অধিকাংশ মানুষেরই পছন্দ হয় না।
ধীর লয়ে মন্তব্য করে, 'তবুও পিতৃ পরিচয় থাকবে না!'

পিতৃ পরিচয়ে আমি সবসময়ই গর্বিত বোধ করি। কিন্তু সবাই যে কারণে দেশের বাড়ির নাম জানতে চায়, সেটা আমি বুঝি। তাই ওঁদের সরল সহজ প্রশ্নের উত্তরে এতো প্যাঁচাই। ভাষা, আচরণ বা অন্য যে কোনো ভাবেই আঞ্চলিকতার প্রভাবে আমি প্রভাবিত নই বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

একদিন আমার ছোট আপা সুফিয়া যাকারিয়া যখন বললো, 'আমাকে কেউ দেশের বাড়ি জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতাম, বাংলাদেশ। কিন্তু এখন বলা শুরু করেছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বলতে ভালই লাগে।'

আমিও বললাম, এখন থেকে আমিও তাই বলবো।

আব্বার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি আব্বার জন্য স্মরণসভা আয়োজন করায় আমরা আব্বার গ্রামে কিছু করার পরিকল্পনা ৭ দিন পিছিয়ে দিই। ৩ মার্চ, শুক্রবার বাদ জুম্মা সমস্ত গ্রামবাসীকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করি। শুনেছি, মৃত বাবা/মা যা পছন্দ করতেন, তা চালু রাখা সোয়াবের কাজ। সেই সাথে ওদের প্রিয়জনদের সাথে সৎভাব বজায় রাখা। তাই যতটুকু সম্ভব আমার বাবার সাথে যারা তাঁর শেষ সময় পর্যন্ত কাজ করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিক ও স্থাপত্য গবেষণায়, তাঁদরকেও নিমন্ত্রণ করি যানবাহনের ব্যবস্থা করে। আমাদের পাড়ায়ও বলি দু'চারজনকে, যারা আব্বার শেষ সময় পাশে ছিলেন, আব্বাকে সময় দিতেন, আব্বার কথা শুনতেন আগ্রহের সাথে। সবাই বেশ আগ্রহের সাথে আমাদের সহযাত্রী হন বাঞ্ছারামপুর উপজেলার দরিকান্দি গ্রামে যেতে।

আমাদের পাঁচটা গাড়ি আর ভাড়া করা একটি ১২ আসনের মাইক্রোবাস নিয়ে যাত্রা করি দরিকান্দির উদ্দেশে শুক্রবার সকালে। ফেরি জটের কারণে পৌঁছুতে পৌঁছুতে জুম্মা পার হয়ে যায়। সমবেত গ্রামের অতিথিদের সাথে দেখা হয় না। কিন্তু অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হয় নি। আমাদের চাচাতো ভাই আলমগীর ভাই আর মাহিমের নিরলস দায়িত্ব পালনের কারণে।

আব্বার বাড়িতে আর তার উঠানে সমবেত হই আমরা সব ভাইবোন আর আগত আত্মীয়- স্বজন। যারা অনেকে ঢাকায় থাকলেও দেখা কদাচিৎই হয়ে থাকে। সময়টা খুবই ভাল কাটে।

তারপর পার্শ্ববর্তী স্কুল প্রাঙ্গণে খেতে বসি, যেখানে গ্রামের সকল অতিথিকে খাওয়ানো হয়েছে। আমরা সব ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন আর ঢাকা থেকে আমাদের সাথে আগত তরুণ সাংবাদিক,গবেষক দল, একসাথে খেতে বসি। সবাই সবার সঙ্গ উপভোগ করি আবেগের সাথে। আমি আমার বড় চাচার ছেলে আলমগীর ভাইকে বলি, 'আগামী বছর আরও বড় করে করবো, আর সকাল সকাল পৌঁছুবো।

তখন আলমগীর ভাই বলেন, 'চাচা এসব চিন্তা করেই ওনাকে গ্রামে কবর দিতে বলেছেন। এই যে আমরা প্রতি বছর সমবেত হব গ্রামে। তা না হলে তোমাদের তো আর গ্রামে আসাই হতো না!'

কথাটা যে কতো সত্যি তা আমার থেকে ভাল কেউ জানে না। আব্বা জীবিত থাকা অবস্থায় এ নিয়ে আমাকে অনেক বার বলেছিলেন। যাক অন্তত আব্বার শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করতে পেরেছি।

আব্বা অত্যন্ত দূরদর্শী মানুষ ছিলেন। সময় সময়ে আমাকে কিছু সতর্কতামূলক উপদেশ দিয়েছিলেন। যা আমি পালন করিনি ও পরে ধরা খেয়েছি।

আব্বার আট বিঘা একটা দীঘি ছিল গ্রামে। মাছের চাষ করাতেন। আমাদের কেউ না থাকায়, সব মাছ চুরি হয়ে যেত। আব্বা আমাকে এর দায়িত্ব নিতে অনেকবার অনুরোধ করেছিলেন। আমি তা তো নেইই নি, উলটো আব্বাকে দিয়ে দীঘি জমি সব বিক্রি করিয়েছি। শেষ বয়সে এই লিকুইড মানি ওনার কাজে লাগবে বলে। আজ যোগাযোগ ব্যবস্থা এতো উন্নত হওয়ায় দুঃখ হচ্ছে, 'ইস দীঘিটা যদি থাকতো।

এক সময় খুব শুকনা ছিলাম। নিজে নিজেই মোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করে খুব অল্প দিনে অনেক ওজন গেইন করলাম। আব্বাকে খুশি খুশি মুড নিয়ে বলাতে, আব্বা বলেছিলেন, এটা ভাল লক্ষণ না, বি কেয়ারফুল!' তার কিছু দিন বাদেই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হলাম। আব্বাকে বলাতে মনে হলো আমার থেকে উনিই কষ্ট পেলেন বেশী! বাবা বলে কথা।

এর আগে আব্বা আমাকে প্রায়ই নিয়মিত হাঁটতে বলতেন। আমি সময়ের অভাবের কথা বলে উপেক্ষা করতাম। আর যখন ডায়াবেটিস ধরা পড়লো, তখন হাঁটার সময়ের অভাব হলো না। রোজ হাঁটতাম আর ভাবতাম, ইস! আব্বার কথা যদি আগে শুনতাম।
এরকম অনেক ঘটনার কথা বলতে গেলে লেখা আর শেষ হবে না।

গত শুক্রবারে ফিরে আসি। খাওয়া দাওয়া করে আমাদের বাড়ির উঠানে সবাই গোল হয়ে বসে গল্পে ডুবে যাই। কিন্তু সবার মনেই উসখুশ ভাব, আসল জায়গায় কখন যাব? আমরা আব্বার কবরে যাই। সেখানে স্থানীয় মৌলবির উপস্থিতিতে আমরা সবাই দোওয়া করি। মৌলবি আমার বোনদের পরে আসতে বলেন। দোওয়া শেষে ফিরে আসার সময় বোনদের বলি কবরের পাশে যেতে।
এক বোন বলেন, 'থাক এখান থেকেই দেখি।'
হয়তো নিয়ম কানুনের কথা ভেবেই এই ইতস্ততা।
আমি বলি, 'যাও, পাশে দাঁড়াও। এক অন্য রকম শান্তি পাবে।'
আমার বোন সাথে সাথেই চলে গেল কবরের পাশে।

আমি যখন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল, আব্বা আমার সামনে বারান্দার ইজি চেয়ারে শুয়ে আছেন, চির চেনা সেই হাসি মুখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার সারা শরীরে কেমন যেন এক শান্তির শিহরণ ছড়িয়ে পড়লো।

আর মনে মনে বলছিলাম, আমার দেশ দরিকান্দি গ্রাম, বাঞ্ছারামপুর উপজেলা, বাহ্মণবাড়ীয়া জেলা।

বাবা দিবস

আমার সব কাছের মানুষই জানে, আমার ঘুমের সমস্যা কত প্রকট। সেহেরির পর ঘুম দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করি। আজ রাতে মনে হলো সেহেরির আগেই একটা ছোট্ট ঘুম দেওয়া যাবে। ঘুমুতে যাওয়ার আগে সেল ফোনটা চার্জারে দিতে গিয়ে চোখে পড়লো ফেসবুকে আমার ছোট আপার একটা পোস্ট। একটানে পড়ে ফেলে শুতে গিয়ে দেখলাম, আমার দুচোখ জলে ভিজে যাচ্ছে। কিছুতেই সামলাতে পারছি না। তাই সামলানোর আর কোন চেষ্টা না করে নিজেকে কাঁদতে দিলাম। কিন্তু আমার কান্না আমারই দেওয়া স্বাধীনতা পেয়ে তার পূর্ণ অপব্যবহার করে চলেছে।

ছোট আপার লেখা পড়ে জানতে পারলাম, আজ বাবা দিবস। কোনো বিশেষ দিনকে কোনো বিশেষ উপলক্ষ বানানোকে আমি তেমন সমর্থন না করলেও আজ ব্যতিক্রম ঘটলো। ওর লেখার প্রতিটি শব্দ, বাক্য আমাকে কাঁদিয়ে চলেছে। আব্বাকে যেদিন আইসিইউতে পাঠালাম, সেদিন অনেক কেঁদেছিলাম। কিন্তু মৃত্যুর পর কেন যেন তেমন কান্না আসেনি। হয়তো জেনে গিয়েছিলাম নিষ্ঠুর সত্যটি।

আমার বাবা গত হয়েছেন প্রায় চার মাস হতে চললো। তিনি ৯৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। সবাই বলে আমরা ভাগ্যবান। নিশ্চয়ই ভাগ্যবান। প্রায় সবাই কোনো না কোনো ক্ষেত্রে ভাগ্যবান। যে যেটা পেয়ে অভ্যস্ত সে সেটাকে 'ফর গ্র্যান্টেড' ভাবতে অভ্যস্ত থাকে। তেমনি আমরা সব ভাই-বোনই ধরে নিয়েছিলাম, তিনি থাকবেন আমৃত্যু আমাদের ছায়া দিয়ে। তাই তাঁর চলে যাওয়াটা আমাদের কাছে অসময়ের চলে যাওয়াই মনে হচ্ছে।

আব্বা যে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, জেনেছি আব্বা কত কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন। তাঁর কাজের প্রতি সততা, একাগ্রতা, সাধনা, জ্ঞান পিপাসা ছিল ঈর্ষণীয়। তাঁর বিস্তৃত কর্মজীবনে তেমন মূল্যায়ন না হলেও, শেষ বয়েসে মিলেছে রাষ্ট্রীয় পদক থেকে শুরু করে অনেক সম্মাননা, প্রচারণা ও ভালবাসা। আব্বা সম্বন্ধে পাতার পর পাতা লিখে ভরে ফেললেও মনে হবে কি যেন বাদ পড়ে গেল! তাই সে চেষ্টা করবো না। শুধু এটুকুই বলবো যে, এতো কিছুর মাঝেও তিনি ছিলেন একজন খু-উ-ব ভাল বাবা।

আমরা সবাই কোনো না কোনো সময় ভাবতাম, তিনি বোধহয় আমাকেই (যার যার নিজেকেই) বেশী ভালবাসেন। তাঁর জীবনের শেষ কটি বছর তাঁর সাথে নিবিড়ভাবে কাটিয়ে জেনেছি, তাঁর প্রতিটি সন্তানের জন্যই ছিল আলাদা করে তুলে রাখা ভালবাসা। আব্বা আমাদের জীবনে এমনভাবে মিশে আছেন যে, আব্বাকে স্মরণ করার কোনো উপলক্ষের প্রয়োজন নেই। আব্বার বিছানা, ব্যবহৃত লাঠি, বারান্দায় ইজি চেয়ার, শমরিতা হাসপাতাল (যেখানে আব্বা জীবনের শেষ বছরটি পার করেন), এমনকি ঢাকার যে কোন রাস্তা-ঘাট, যেখানে আব্বাকে নিয়ে গিয়েছি, প্রতিনিয়ত আব্বাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তাঁকে ভুলি কি করে!

সর্বক্ষণ আমাদের সবকিছু ভাল চাওয়া, আমাদের বাবাকে আল্লাহ যেন ভাল রাখেন। মাফ করে দিন সব ছোট বড় ভুল ত্রুটি। আল্লাহ চাইলে কি না পারেন!

বাবা দিবসে সকল বাবার জন্য শুভকামনা।

আব্বার সাথে শেষ কোরবানি দেওয়া

আমার আব্বা আর নেই। কিছু দিন আগ পর্যন্তও ছোট বাচ্চাদের মত মনে হত, আব্বা

কোনোদিনই মরবেন না। আমাকে কোনদিনই পিতৃহারা হতে হবে না। অন্তত মাস তিনেক আগ পর্যন্ত এমনই মনে হত। সেই ভুল ভেঙ্গেছিল কয়েক মাস আগে যখন আমার চেনা অচেনা প্রায় সমস্ত ডাক্তারই আব্বার শারীরিক ভঙ্গুর অবস্থার সতর্কবাণী তুলে ধরেছিলেন।

যখন ডাক্তারদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে (কোন লাভ নেই এই কারণে) আই.সি.ইউ'তে আব্বাকে স্থানান্তর করলাম, তখন একেবারেই মুষড়ে পড়েছিলাম আমরা সবাই। আই.সি.ইউ এর সামনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে হাঁটতে হাঁটতে চোখের পানি লুকোচ্ছিলাম। সে যাত্রায় তিনি বেঁচে গেলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তবে ডাক্তারদের ব্রিফিয়েও বুঝতে পারলাম, এই স্বস্তি ক্ষণস্থায়ী। কয়েক ঘন্টা বা দিনের ব্যাপার। তাই যখন সেই ডি ডে টা এলো, তখন কান্না আসে নি। সময়টা খালি স্থির হয়ে গিয়েছিল।

তবে সেদিন রাতের বেলায় খুব ইচ্ছে হচ্ছিল কিছু লিখি। এমন কিছু যা পড়ে আমার সাথে সবাই যেনো কাঁদে। কিন্তু পরদিন আব্বার দেশের বাড়িতে ভোরে রওনা হবো দাফন করতে, তাই আর লিখতে বসলাম না। অতটা স্যাডিস্ট হতে পারলাম না।

আজ নির্ঘুম রাত কাটিয়ে মনে হল, লিখি। তবে কাঁদাতে নয়। আব্বাকে নিয়ে আমার মজার কোনো স্মৃতি।

বছর তিনেক আগের ঘটনা

আব্বা ভাল গরু চেনেন। প্রতিবার তাই গরু ঠিক করে আব্বার সার্টিফিকেট নিয়ে, তারপর গরু কিনতাম। গরুর হাট আমাদের বাসার গলিতেই বসতো সব সময়। সেবার হঠাৎ আইন-শৃংখলা বাহিনীকে বেশ তৎপর দেখলাম। বাড়ির আশেপাশে কোনো গরু নেই।

আমরা বাপ বেটা গরু কিনতে রওনা হলাম আমার গাড়িতে। কিছুদূর যেতেই গরুর হাট দেখতে পেলাম। একটা গরু পছন্দও হয়ে গেল। মাঝারি সাইজের হৃষ্টপুষ্ট দেশি গরু। আব্বা মত দেওয়ায় দামদর করে নিয়ে এলাম গরু বাসায়। আব্বার বেশী কষ্ট না হয় এই ভেবে।

আমার আব্বা আবার সবার বাড়ি ঘরের খবর নেন। সেই খবর নিতে গিয়ে জানা গেলো, আমাদের কলাবাগানের বাড়ির প্রথম বুয়ার নাম ছিল আখতারের মা। আমাদের গরু বিক্রেতা আর কেউ নয়, সেদিনের সেই ছোট্ট আখতার! বাহ, বেশ মজা দিয়ে শুরু হল আমাদের গরু কেনার কাহিনী। কিন্তু এর থেকেও মজা আর বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য।

গরু আমাদের গ্যারেজের গেটে বাঁধা। বাড়ির সামনে আমার গাড়ি পার্ক করা। তাতে হেলান দিয়ে গর্বিত পিতা পুত্র গরু নিয়ে গল্পে মশগুল উপস্থিত দর্শকদের সাথে। আমাদের কেয়ার টেকার আছে। আছে পাড়া প্রতিবেশী। কেউ খেয়ালই করলাম না গরুটা কখন হাঁটা দিয়েছে, দড়ি খুলে। সে প্রথমে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি ভয়ে আমার আব্বার সামনে দাঁড়ালাম, পাছে আব্বাকে গুঁতো দেয়। কিন্তু গরু বাবাজির আমাদেরকে পছন্দ হলো না। সে হাঁটা দিল আমার গাড়ি আর সিঁড়ির ঘরের ওয়ালের মাঝে সৃষ্ট সরু পথ দিয়ে। গন্তব্য নিচ তলায় আমার ফ্ল্যাট। আমার বারান্দার দরজা খোলা। সবাই সবিস্ময়ে গরুর দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ আমার বোধোদয় হলো, আমার মেয়ে ও স্ত্রী তো অরক্ষিত অবস্থায় আছে। আমি দৌড়ে গেলাম গরুর পেছনে। চিৎকার করে, বেল দিয়ে জানাতে চেষ্টা করলাম ওদের, বাঘ আসছে (গরু)। উপস্থিত জনতা আমাকে নিষেধ করলো চিৎকার করতে। তাতে নাকি গরু উত্তেজিত হয়ে যাবে।

আমি বললাম, 'রাখেন আপনাদের উত্তেজনা। আমাকে তো আমার বউ বাচ্চাকে বাঁচাতে হবে।'

আমার আব্বা সায় দিলেন আমাকে। ততক্ষণে গরু বাবাজি বাসার অন্দর মহলে প্রবেশ করেছে। সে বারান্দা হয়ে ড্রয়িং রুম পার হয়ে, ডাইনিং রুমে ঢুকলো। সৌভাগ্যবশতঃ আমার স্ত্রী ওখানেই ছিল। সে চিৎকার করে আমার মেয়েকে সতর্ক করে দিয়ে বেডরুমের দরজা বন্ধ করে দিল। গরু বাবাজি চারিদিক বন্ধ দেখে কিচেনে ঢুকলো। সাথে সাথেই আবার বেরিয়ে এল। যে পথ দিয়ে এসেছিল সে পথ দিয়েই বেরিয়ে গেল। যেন কোথায় তাকে রান্না করা হবে সেটা কতটা স্বাস্থ্যকর তা জানা ওর জরুরি ছিল।

যাই হোক, সেই বার আমরা বাপ-ব্যাটা দুজনে একসাথে কোরবানি দিয়ে নিজেরা এবং পরিবারের অন্যদের সাথে অনেক আনন্দ উপভোগ করি। আমি কোরবানি দেওয়ার ব্যাপারে একটু ইতস্তত করছিলাম। কিন্তু আব্বা বলাতে কেন জানি মনে হয়েছিল, আর যদি না দিতে পারি আব্বার সাথে! তাই রাজি হয়ে যাই। এরপরের ঈদে সপরিবারে ব্যাংকক বেড়াতে যাই। আব্বা একটু আহত হলেও খুশি হয়েছিলেন ছেলের বিদেশ ভ্রমণে। গতবার তো দেওয়াই হয়নি। ওই বারই প্রথম ও শেষ কোরবানি দেওয়া আমার আব্বার সাথে। সেটা মনে করে এখনো স্বস্তি পাই। তা না হলে আব্বার জন্য অনেক দুঃখের সাথে আরও একটা দুঃখ রয়ে যেত।
তাঁকে আল্লাহ যেন শান্তিতে রাখুন
রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানি সগিরা

বাবা যখন বন্ধু

কৈশোরে আর তারুণ্যে আমার বাবার সাথে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল বিভিন্ন কারণে। সেই সময় সাপ্তাহিক বিচিত্রায় একটা গল্প পড়েছিলাম। পড়ে মনে হয়েছিল, গল্পটা ঠিক যেন আমাকে নিয়ে। গল্পটার প্রধান চরিত্র একজন তরুণ। সে তার বাবাকে ভীষণ ভয় পায়। একরাতে স্বপ্ন দেখলো ওর বাবা ওর বন্ধু হয়ে গিয়েছে। ওর পাশাপাশি বন্ধুর মত হাঁটছে আর গল্প করছে। স্বপ্নভঙ্গের পর স্বাভাবিকভাবেই সে খুব কষ্ট পেয়েছিল।

আমিও এই গল্পের তরুণের মতো, একটা চাপা কষ্ট নিয়ে আমার তারুণ্য কাটিয়েছি। মনে মনে সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন চেয়েছি। পৌঢ়ত্বে এসে কখন যে বাবা আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন টেরই পাইনি। রোজ আব্বার সাথে কিছুক্ষণ গল্প না করলে যেনো ভাতই হজম হতো না। মাঝে মাঝে যেতাম শুধু দায়িত্ব পালন করতে, রুটিন মাফিক খোঁজ-খবর নিতে। কিন্তু যেয়ে নিজেই গল্পে মশগুল হয়ে যেতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

আমাদের চিন্তাধারার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিল ছিল। তাই গল্পের টপিকের অভাব হতো না। আর রোজকার দিনলিপির খোঁজখবরও আব্বা নিতেন। সারাদিন কি খেলাম, কি করলাম।

আমার বেশ কিছু খুব ভাল বন্ধু আছে। আব্বা প্রায়ই বলতেন, 'you are blessed with friends'।

আজ দুইবছরের বেশী হলো আব্বাকে হারিয়েছি। আজ বাবাদিবসে মনে হচ্ছে, কেন আব্বাকে বলতে পারিনি, I am blessed with friends, but I was really blessed to get you as my best friend, whom I miss and will miss a lot!

লেখক: লেখক

গাজী কালু চম্পাবতী উপাখ্যান : পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সম্পাদনা

ড. সাইমন জাকারিয়া

গাজী কালু চম্পাবতী উপাখ্যান বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতিতে এখনও অত্যন্ত জনপ্রিয়। জন্মসূত্রে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ অঞ্চলে বাল্য-কৈশোর অতিবাহিত করার গুণে 'গাজী-কালু-চম্পাবতী উপাখ্যান' এর ঐতিহ্যবাহী মুখরা [মৌখিক] পরিবেশনরীতির সাথে নিবিড় পরিচয় ঘটে। কেননা, ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ থানার বারোবাজার গ্রামে রয়েছে এই উপাখ্যানের তিন কিংবদন্তি চরিত্র গাজী, কালু ও চম্পাবতীর সমাধি। শুধু তাই নয়, সেই সমাধিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিচিত্র লোকাচার, লোকবিশ্বাস এবং লোকপরিবেশনের নাট্যগীতাভিনয়ের ঐতিহ্য; আর এসব কিছুই ঘটে মূলত গ্রামীণ নিঃসন্তান মানুষের সন্তান আকাঙ্ক্ষায় বা সন্তান প্রাপ্তিতে বা স্বামী-সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার মানত বা মানসিকের কৃত্যানুষ্ঠান হিসেবে।

আমাদের বসন্তপুর গ্রামের বহু বাড়িতে তো বটেই, এমনকি আমাদের নিজের বাড়িতেই প্রতিবছর 'গাজীর গান' নামে 'গাজী কালু চম্পাবতী উপাখ্যান' পরিবেশন হতে দেখেছি; নিজের বাড়িতে গাজীর গান আয়োজনের প্রধান কারণ ছিলো–আমাদের দাদির মানত বা মানসিকের পর নোয়াচাচার সংসারে গাজী ও কালু নামে দুই সন্তানের জন্ম ঘটে; তার ফলশ্রুতিতে দাদি ও নোয়াচাচা যতদিন বেঁচে ছিলেন আমাদের বাড়িতে প্রতিবছর অন্তত একবার গাজীর গানের আসর বসতো। কিন্তু বাল্য বা কৈশোরের আমাদের জানার কোনো সুযোগই ছিল না যে, গাজীর গানের আখ্যান বা উপাখ্যানের কোনো লিখিতরূপ বা প্রকাশনা আছে। পরবর্তীতে যৌবনে পদার্পণ করার ক্ষণে বাংলা সাহিত্যে 'গাযী কালু চম্পাবতী উপাখ্যান' শিরোনামে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত একটি মহাগ্রন্থের সন্ধান পাই, এই গ্রন্থটির সম্পাদক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া। গ্রন্থের ভূমিকায় বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ লিখেছেন–

"গ্রাম-বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের এককালে অতি সুপরিচিত হলেও সুধীসমাজে গাজীকাহিনীর লিখিত রূপের পরিচয় ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে বটতলার পুঁথির মাধ্যমেই, বিশেষ করে আবদুর রহিম ও আবদুল গফুর নামক দু'জন কবি রচিত কাহিনীর মাধ্যমেই এ কাহিনী সমগ্র বাঙলায় পরিচিত ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দু'জন কবির রচনা আবিষ্কার করেছেন জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া এবং বাংলা একাডেমির মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছেন। এ দু'জনের মধ্যে একজন হচ্ছেন গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার খড়িয়াবাদা গ্রামের কবি খোদা বখশ এবং অন্যজন হচ্ছেন খুব সম্ভত বগুড়া জেলার কবি হালু মীর। তাঁদের রচনা দেখে মনে হয়, উভয়েই ছিলেন মোটামুটি বড় মাপের কবি। এ দু'জন কবির রচনাকে অসাধারণ নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সহকারে সম্পাদনা করে জনাব যাকারিয়া প্রকাশ করেছেন।"

উদ্ধৃত ভূমিকাংশ হতে আবুল কামাল মোহাম্মদ যাকারিয়ার দু'টি সত্তার কথা জানা যায়–১. তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি খোদা বখশ ও হালু মীর রচিত "গাযী কালু চম্পাবতী" শীর্ষক দুটি কাব্যের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারক তথা সংগ্রাহক এবং ২. তিনি তাঁর আবিষ্কৃত বা সংগৃহীত দু'টি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এই দু'টি সত্তাকে বিবেচনায় নিয়ে আমরা যদি আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার "বাংলা সাহিত্যে গাজী কালু চম্পাবতী উপাখ্যান" শীর্ষক গ্রন্থটি গভীরভাবে পাঠ করি তাহলে দেখতে পাই–তিনি তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় এই কাব্যের পাণ্ডুলিপি দুটি সংগ্রহ করেন এবং তার তথ্য তিনি গ্রন্থমধ্যে সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন; যেমন–গ্রন্থটির চতুর্থ পরিচ্ছেদের পাদটীকায় তিনি কবি খোদা বখশ রচিত কাব্যের পাণ্ডুলিপি ও কবি-পরিচিতি দিতে গিয়ে লিখেছেন–

"দিনাজপুর জেলার প্রশাসনিক কার্যে নিযুক্ত থাকাকালীন গ্রন্থকার কর্তৃক ১৯৬৭ সালে রংপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার অন্তর্গত চরনওয়া গ্রামের অধিবাসী জনাব সৈয়দ আলী সরকারের নিকট থেকে অন্যান্য আরও কয়েকটি পাণ্ডুলিপিসহ এটিও সংগৃহীত হয়। লিপিকর মরহুম খয়েবজ্জামান ছিলেন জনাব সৈয়দ আলী সরকার ও তৈয়ব আলী সরকারের পিতা। ঘোড়াঘাট ডাকবাংলার তদানীন্তন চৌকিদার ও সুপণ্ডিত মরহুম নইম-উদ্-দীন সরকার ছিলেন লিপিকরের ভাগিনা। তারই সাহায্যে ও জনাব সৈয়দ আলীর বদান্যতায় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল।"

আবার হালুমীর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন–

"এই পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে বন্ধুবর সুকবি মুফাখখারুল ইসলাম সাহেবের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে। তিনি এটি উদ্ধার করেছিলেন পূর্বোক্ত বড়বিলা পরগনার মিঠিপুর গ্রামের আবদুল কুদ্দুস ইবনে মোবারক আলী ফকির সাহেবের কাছ থেকে। এই পাণ্ডুলিপির প্রথম ২ পালার লিপিকর ছিলেন মোবারক আলী ফকির। লিপিকাল-১২৯১ সাল।"

এছাড়াও তিনি হালু মীর রচিত আরও তিনটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের পরিচয় দিয়েছেন, যার মধ্যে দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সম্পর্কে লিখেছেন–

"এই পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছে বগুড়া জেলার নারচী গ্রামের অধিবাসী ও সরকারের খাদ্য দফতরের অবসরপ্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোলার বন্ধুবর সিরাজুল হক খান সাহেবের সৌজন্যে।"

লক্ষ্যণীয়, মূলত পেশাগত দায়িত্ব পালনের সমান্তরালে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া পাণ্ডুলিপিগুলি সংগ্রহ করেন, আর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলি সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি তুলনামূলক পাণ্ডুলিপি পাঠ পদ্ধতিকে আশ্রয় করেছেন, এক্ষেত্রে তিনি হস্তলিখিত কাব্যের পাণ্ডুলিপির পাশাপাশি মুদ্রিত কাব্যসমূহ বিবেচনায় গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, সম্পাদিত আকারে নিজের সংগৃহীত "গাজী কালু চম্পাবতী কাব্যে"র পাণ্ডুলিপি প্রকাশকালে তিনি পাণ্ডুলিপিধৃত মূল উপাখ্যানের উদ্ভব, ক্রমবিকাশের আলোচনায় নৃতাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করেছেন, যাকে বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

আমরা জানি, গাজী-কালু বাংলাদেশের লোকায়ত জীবনে মুসলিম পির হিসেবে পূজিত। এক্ষেত্রে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া "বাংলা সাহিত্যে 'গাযী কালু চম্পাবতী উপাখ্যান"

শীর্ষক পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার শুরুতেই ভাবাবেগ পরিহারের মাধ্যমে ইতিহাসের কষ্টিপাথরে বিচার করে 'গাযী কালু চম্পাবতী উপাখ্যান' এর সত্যানুসন্ধানে তৎপরতা প্রদর্শন করেছেন। এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাস, পির-দরবেশদের ভূমিকা, পির-দরবেশদের শাখা-খানদান ও দরগার তালিকা, কেরামতি প্রদর্শনকারী পিরদের পরিচয়, ইসলাম প্রচারে সেনানী-শাসকের ভূমিকার সমান্তরালে যোদ্ধাপির-দরবেশদের কেরামতির প্রসিদ্ধি ও কিংবদন্তির প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্থানিক-কালিক কারণে পিরসাহিত্যের উদ্ভব, সত্যপির, মানিকপির, একদিলপির ইত্যাদি পিরের নানাবিধ কিংবদন্তি এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে গাজী কাহিনীর উদ্ভব, গাজী কাহিনীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা বিচার করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে গাযী কালু চম্পাবতী উপাখ্যানের কবি পরিচিতিসহ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত কাব্যের পরিচিত এবং তার তুলনামূলক আলোচনা প্রদান করা হয়েছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে গাজী পিরের উপাখ্যান নির্ভর সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ এবং কাব্যের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক শিল্পসুষমা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এরপর আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি দু'টি পাঠ-পাঠান্তর, শব্দার্থ, টীকাসহ সংযুক্ত কয়েছেন। গাযী কালু চম্পাবতী উপাখ্যান সংকলন ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর নিবেদনকে এখনও বাংলাদেশে প্রচলিত বহু অগ্রন্থিত হস্তলিখিত ও মৌখিকভাবে চর্চিত পাণ্ডুলিপি গবেষণা ও সম্পাদনার দিকনির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

লেখক: গবেষক ও নাট্যকার

আমার দেখা আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া

মোহাম্মদ আহসানুল হাদী

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া স্যারের সাথে আমার পরিচয় খুব বেশি দিনের না। ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির মিটিং এ প্রথম দেখা। মানুষটিকে যতই দেখেছি ততই মুগ্ধ হয়েছি। ওনার বিনয়, নম্রতা, জ্ঞানের গভীরতা, কাজের প্রতি মনোযোগ ও একাগ্রতা সবকিছু আমাকে অভিভূত করেছে। মানুষকে কিভাবে সম্মান করতে হয় তিনি তা খুব ভালোভাবে জানতেন। যতদিন ওনার সাথে দেখা হয়েছে, কখনোই আগে সালাম দিতে পারিনি। সবসময় তিনিই আগে সালাম দিতেন।

ছোটদের সাথে বড়দের, জ্ঞান পিপাসুদের সাথে জ্ঞানীদের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত তা ওনার কাছ থেকে শেখার আছে বলে আমি মনে করি। বাংলায় পণ্ডিত শব্দটি অনেক শুনেছি। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়াকে দেখে মনে হয়েছে তিনি ছিলেন পাণ্ডিত্যের মূর্ত প্রতিক। একজন মানুষ একসাথে জ্ঞানের কয়টি শাখায় বিচরণ করতে পারে তিনি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন।

ওনার জ্ঞান পিপাসা ছিল অপরিসীম। যে কয়বার তার সাথে দেখা হয়েছে, অধিকাংশ সময়েই তাঁকে বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতে দেখেছি। একদিন বিকেলে ওনার কলাবাগানের বাসায় দেখা করতে গিয়েছিলাম । উষ্ণ আতিথেয়তায় তিনি আমাদেরকে গ্রহণ করেছিলেন। যে রুমে তিনি থাকতেন তার চতুর্দিকে বই দেখতে পেলাম। আমরা যখন পৌছেছিলাম তখনো তিনি বই পড়ছিলেন। আমাদেরকে দেখে নিজে উঠে আসলেন। ইতিহাস ও অনুবাদ সাহিত্যে তিনি কি কি কাজ করেছেন একে একে তা আমাদেরকে দেখালেন। বুঝতে পারলাম আল্লাহ উনাকে অসাধারণ পাণ্ডিত্য দান করেছেন।

তিনি ছিলেন একাধারে ইতিহাসবিদ, প্রত্নতত্ত্ব গবেষক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও একজন সফল অনুবাদক। মুঘল ও সুলতানি আমল নিয়ে ফারসি ভাষায় লেখা পুরনো অনেক বই তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। ফারসি থেকে বাংলায় অনূদিত মিনহাজ-ই-সিরাজ লিখিত তবকাত ই নাসিরি, সৈয়দ গোলাম হোসেন তাবাতাবাইর সিয়ার-উল-মুতাখখিরিন, মোজাফ্ফর নামা, নওবাহার ই মুর্শিদ কুলি খান, ইউসুফ আলি খানের লেখা তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই মহাবত জঙ্গী-এই বই গুলো তিনি মূল ফারসি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। একজন ইংরেজি শিক্ষিত মানুষ ফারসি থেকে এতগুলো বই বাংলায় অনুবাদ করেছেন দেখে সত্যিই অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। তার অনুবাদ এর মানও অসাধারণ।

পরে স্যারের কাছ থেকে তার ফারসি চর্চার ইতিহাস জানতে পারলাম। স্কুলে যাবার আগেই শৈশবে মক্তবে তিনি ফারসি শিখেছিলেন। তাঁর গ্রামের পাশের রূপসদি বৃন্দাবন হাই স্কুলের হেড মওলানা আব্দুর রহমানের কাছেও কিছুদিন ফারসি চর্চা করেন। এইচ এস সি তে ঢাকা কলেজেও তিনি ফারসি পড়েন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে ভর্তি হলেও সেখানে সাবসিডিয়ারি সাবজেক্ট হিসেবে ফারসি চর্চা করেন। জীবনে তিনি এই ফারসির জ্ঞানকে আমাদের বাঙালি জাতির ইতিহাস ঐতিহ্য উদঘাটনে ব্যবহার করেছিলেন।

ওই দিন আমাদের যাওয়ার মূল কারণ ছিল তাওয়ারিখে ঢাকা বইটি তিনি অনুবাদ করতে চাচ্ছিলেন। বইটি মূল ফারসিতে লেখা ছিল। এটি অনুবাদ করতে পারলে ঢাকা শহরের অজানা অনেক ইতিহাস বের হয়ে আসবে। এ জন্য তিনি বইটি অনুবাদ করত উদগ্রীব হয়ে ছিলেন। কিন্তু তার সংগৃহিত মূল ফারসি বইটি খাত্তে নাস্তালিকে লেখা ছিল। খাত্তে নাস্তালিক একটু প্যাঁচানো হরফে লেখা হয় বলে এর পাঠোদ্ধার করা খুব কঠিন। স্যার বইটির পাঠোদ্ধারের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। যদিও এই কাজে ওনাকে সন্তোষজনক ভাবে সাহায্য করতে পারিনি।

যাকারিয়া স্যার বই পড়তে এবং লিখতে ভালবাসতেন। পুঁথি সাহিত্যের ব্যাপারে ওনার অনেক আগ্রহ ছিল। ওনার কাছে পুঁথির বড় একটি সংগ্রহ রয়েছে। পুঁথি বিষয়ক তিনি অনেক বই লিখেছেন। গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস এর মধ্যে অন্যতম। তিনি কবিতা শুনতে ভালবাসতেন। বাংলা, ফারসি ও উর্দু ভাষার অনেক কবিতা তাঁর মুখস্থ ছিল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি কবিতাগুলো আবৃত্তি করতেন। কোন বিষয় সম্পর্কে কারো কোন কবিতা জানা থাকলে তিনি তা আগ্রহ সহকারে শুনতে চাইতেন। অনেক সময় কবিতা শোনার পর বাহ বাহ বলে উৎসাহিত করতেন। প্রায় শতবর্ষ বয়সে স্যারকে পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার মনে হয়েছে বার্ধক্য তাকে কখনো ক্লান্ত করতে পারেনি। শতবর্ষেও মন মানসিকতায় তিনি যেন আমাদের চেয়েও যুবক ছিলেন। একাধারে তিনি কাজ করে যেতেন, কিন্তু কখনো কাজের প্রতি বিরক্তি বা ক্লান্তি দেখতে পাইনি। পড়াশুনা আর গবেষণাই যেন ছিল তাঁর নেশা এবং পেশা।

যাকারিয়া স্যারের সাথে জাতীয় জাদুঘর ও পুরনো ঢাকার কিছু মন্দিরের প্রতীমা দেখতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। কোনো মূর্তি দেখার সাথে সাথে তিনি তার প্রকার, এই মূর্তি কোন আমলের, সেটি কি ধরনের মূর্তি, কারা এই প্রতিমার অর্চনা করে থাকে তা বলে দিতে লাগলেন। প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে স্যারের জ্ঞানের বিশালতা সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম। স্যারের লেখা বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের হারিয়ে যাওয়া অনেক স্থাপত্য স্থাপনার তথ্য তিনি এই বইতে দিয়েছেন।

স্যারের আরেকটি বিষয় অনেক ভালো লেগেছে। গবেষণা ও সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন যোগ্য সংগঠক ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব। তিনি ভালো ফুটবল খেলতেন। ঢাকা কলেজ ফুটবল টিমের নিয়মিত সদস্য ছিলেন এবং তৎকালীন বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া ও ওয়াপদা ক্লাবের হয়ে প্রথম বিভাগে খেলেছেন। এছাড়াও ভলিবল, টেনিস, দৌড় এ তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। কিছুদিন তিনি বাংলাদেশ ফুটবল টিমের ম্যানেজার ছিলেন। সরকারি চাকরিজীবী হিসেবে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন করেন এবং সব জায়গায় তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এক কথায় তিনি সব্যসাচী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

প্রায় শতবর্ষ বয়সেও তিনি কাজ করে গেছেন এবং অনেক কাজ করার স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর লিখে যাওয়া অনেক পাণ্ডুলিপি এখনো অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। সেগুলো প্রকাশিত হলে আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের অজানা অনেক তথ্য বের হয়ে আসবে। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া স্যারের উপর আরো অনেক গবেষণা করা প্রয়োজন। স্থাপত্য ও ইতিহাস গবেষণায় তিনি যে রোড ম্যাপ দিয়ে গিয়েছেন তার বাস্তবায়ন হলে আমরা অনেক উপকৃত হব। এরকম একজন ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে যেতে পেরেছি এবং তাঁর সাথে বসে একসাথে কাজ করতে পেরেছি বলে আমি গর্বিত। ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটিকে বিশেষ করে তরুণ সরকারকে ধন্যবাদ জানাই এরকম একটি সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। যাকারিয়া স্যার আমাদের ছেড়ে চলে গেলেও আমাদের হৃদয় জুড়ে এখনো তিনি বেঁচে আছেন। আরো শত শত বছর বেঁচে থাকবেন ইনশাল্লাহ।

লেখক: শিক্ষক, ফার্সি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দিনাজপুরের প্রত্নসম্পদ ও আ ক ম যাকারিয়া

ড. শাহনাজ হুসনে জাহান

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব চর্চা ও গবেষণার ইতিহাসে এক অনন্য নাম। সারাজীবন ভিন্ন পেশা এবং উচ্চ সরকারি পদে নিয়োজিত থেকেও তিনি দেশের আনাচে কানাচে ঘুরে আবিষ্কার করেছেন অগণিত প্রত্নস্থল এবং সংগ্রহ করেছেন ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত এবং প্রত্ননিদর্শন। জাতিকে উপহার দিয়েছেন বাংলাভাষায় সমগ্র দেশের প্রত্নসম্পদ নিয়ে রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ। রচনা করেছেন নানা ধরনের প্রত্ননিদর্শন ও প্রত্নস্থল নিয়ে অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত দিনাজপুর জেলার সাথে আ কা মো যাকারিয়ার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। তিনি দিনাজপুরের মানুষ নন। তাঁর জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় অবস্থিত দরিকান্দি গ্রামে। তিনি দিনাজপুরে প্রথম আসেন ১৯৫৮ সালে। না, বেড়াতে নয়, এসেছিলেন দিনাজপুর জেলার রাজস্ব বিভাগে জয়েন্ট কালেক্টর হিসেবে। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ও শিক্ষক আ কা মো যাকারিয়া প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ না করলেও দাপ্তরিক কাজের পাশাপাশি তৎকালীন বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার বেশিরভাগ প্রত্নস্থল পরিদর্শন করেন এবং প্রাচীন ইতিহাস, শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতা নিয়ে গবেষণা করেন। তবে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনির্ভাসিটিতে লোকপ্রশাসন বিষয়ে পড়াশুনা করার জন্য স্কলারশিপ পেলে তিনি সে বছরই আমেরিকা চলে যান।

দেশে ফিরে তিনি আবারও দিনাজপুরে আসেন ১৯৬৭ সালে। তবে এবারে জেলা প্রশাসক হিসাবে। দায়িত্ব গ্রহণ করেই তিনি পাকিস্তান সরকারের প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর বিভাগের কাছে সীতাকোট, চকজুনিদ, চোরচক্রবর্তী, কান্তনগর ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ন এলাকায় উৎখনন ও গবেষণা কাজ পরিচালনা করে দিনাজপুর জেলার বিস্মৃত ইতিহাস পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার অনুরোধ জানিয়ে আবেদন করেন। কিন্তু কোনো লাভ হয় না। পাকিস্তান সরকার অন্য সকল বিষয়ের মত এ বিষয়েও অর্থাভাব দেখায়। এ ঘটনা প্রত্নপ্রেমী যাকারিয়াকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি।

তিনি জেলা পরিষদের কাছ থেকে দশ হাজার (১০,০০০) রুপী অনুদান নিয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহযোগিতায় সীতাকোটে সীমিত উৎখনন কাজ পরিচালনা করতে সক্ষম হন। সীতাকোট প্রত্নস্থলটিকে ওয়েস্টমেকট ১৮৭৪ সালে একটি বাঁধানো পুকুর হিসেবে এবং এফ. ডব্লিউ. স্ট্রং ১৯১২ সালে রামায়ণে বর্ণিত সীতার দ্বিতীয় বনবাসস্থল হিসেবে উল্লেখ করেন। আ কা মো যাকারিয়া ১৯৫৮ সালে প্রথম পরিদর্শনের সময় সহজেই বোঝেন যে, সীতাকোট আর কিছু নয়, প্রকৃতপক্ষে একটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ। উৎখননের ফলাফল তাই হল। আবিষ্কৃত হ'ল

একটি বৌদ্ধ বিহার- যা বর্তমানে সীতাকোট বিহার নামে সুপরিচিত।

সীতাকোট বিহারের উৎখনন কাজ প্রত্নপ্রেমী যাকারিয়ার প্রাচীন কীর্তি অনুসন্ধানের তৃষ্ণা আরো বহুমাত্রায় বাড়িয়ে দেয়। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক থাকাকালে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুরে শতাধিক প্রত্নস্থল পরিদর্শন ও লিপিবদ্ধ করেন। পাশাপাশি বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের পাথর ও ব্রোঞ্জের তৈরি বিভিন্ন দেব-দেবীর ভাস্কর্যসহ নানা ধরনের প্রত্ননিদর্শন সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগ্রহগুলো সংরক্ষণ করার জন্য নাজিমুদ্দিন মুসলিম হল এবং পাবলিক লাইব্রেরির সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৬৮ সালের ১ মে প্রতিষ্ঠা করেন দিনাজপুর মিউজিয়াম।

স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেলে ১৯৭২ সালে তিনি সীতাকোট বিহারের খনন কাজ সম্পাদনের জন্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে আর্থিক অনুদানসহ সকল প্রকার সুবিধা প্রদান করেন।

ছোটবেলা থেকে বাবা-মা'র কাছে বহুবার শুনেছি দিনাজপুরের এই নিষ্ঠাবান জেলা প্রশাসকের কথা। বৃহত্তর দিনাজপুরের সকল মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে এই মানুষটিকে। দিনাজপুরবাসীর কাছে তিনি কেবল একজন প্রজ্ঞাশীল জেলা প্রশাসকই নন, বরং দিনাজপুরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। আ কা মো যাকারিয়া দিনাজপুরের মানুষের স্মৃতিপটে তাই চিরদিন অক্ষয় ও অম্লান হয়ে থাকবেন।

লেখক: প্রত্নতত্ত্ববিদ

বায়ান্ন দিঘি, কিংবা পাপাহার পুকুরের জলে আ কা মো যাকারিয়ার মুখ

স্বাধীন সেন

এবং পুকুরটিও চিন্তাশীল, সৃষ্টিশীল, পুকুরের আনন্দ বেদনা
পাতা হয়ে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে পৃথিবীতে, এই বিশ্বলোকে।
শাপলার ফুলে ফুলে পাতায় কখনো মিল থাকে, মিল কখনো থাকে না।
(বর্ষাকালে, বিনয় মজুমদার)

আজ তারা কই সব? ওখানে হিজল গাছ ছিল এক - পুকুরের জলে
বহুদিন মুখ দেখে গেছে তার; তারপর কি যে তার মনে হল কবে
কখন সে ঝরে গেল, কখন ফুরাল, আহা, - চলে গেল কবে যে নীরবে,
(আজ তারা কই সব, জীবনানন্দ দাশ)

পুরনো পুকুর বা দিঘি আমাদের এই অঞ্চলের ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় কোনো কালেও তেমন গুরুত্ব পেয়েছে বলে ঠাহর করি নাই। ঔপনিবেশিক ও পরবর্তীতে জাতীয়তাবাদী শর্তাধীনে প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস চর্চার যে গতিপ্রকৃতি তাতে বিশেষ কিছু 'বস্তু বা নিদর্শন' গবেষকদের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে 'প্রত্নবস্তুতে' রূপান্তরিত হয়েছে। যে-কোনো সুবৃহৎ কিংবা অলঙ্কৃত স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রপট্ট, পোড়ামাটির চিত্রফলক আর নিদেনপক্ষে কয়েকটি বিশেষ ধরনের মৃৎপাত্র প্রত্নতত্ত্ববিদদের ইতিহাস বর্ণনা ও লিখনে কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে আছে। এখনো মূলধারার চর্চায় একই প্রবণতা। তার কারণ আছে বিভিন্ন।

দক্ষিণ এশিয়ায় প্রত্নতত্ত্ব চর্চার পরম্পরায় অতীত 'গৌরব' ও 'স্বর্ণযুগের' ধারণার উপস্থাপন ও পরিবেশনে উপযোগী হিসাবে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভিন্ন নিদর্শন বাছাই করা হয় ও সুনির্দিষ্ট ভঙ্গিতে সেগুলোকে ব্যাখ্যা করা হয়। সমসাময়িক কালে কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারকে 'অতিরঞ্জিত করে রোমাঞ্চকর ও অনন্য' হিসাবে প্রচার করার জন্যও এসব নিদর্শন উপযোগী বেশি। পুকুর বা দীঘি তো সামান্য এবং তুচ্ছ নিদর্শন। 'অসামান্যতা' আর 'সামান্যতা', 'সাধারণ' আর 'অনন্যের' সীমানা কী-ভাবে আমাদের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় তৈরি হল তা নিয়ে বড় পরিসরে আলোচনা করা যায়। আপাতত, ওই পথে আমি হাঁটব না। এই লেখার উদ্দেশ্য ভিন্ন।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে গত পনের বছরের কাজে আমাদের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন যাকারিয়া স্যারের 'বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ' বইটি, যেটি সম্ভবত প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৪ সালে, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি থেকে। প্রথম দিকের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপে আমরা সব ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক আলামতের/নিদর্শনের জমির উপরে (ও নিচে) উপস্থিতিকে 'প্রত্নস্থান' হিসাবে নথিভুক্ত করা শুরু করি। এদের মধ্যে পুরনো বিভিন্ন পুকুর বা দিঘির ঘাটের নিদর্শনও ছিল। এ

অঞ্চলের প্রত্নস্থান নিয়ে যাকারিয়া স্যারের বর্ণনায় সংলগ্ন বিভিন্ন পুকুর, দিঘি ও জলাশয়ের উল্লেখ আছে। ২০০৫ এর পরে নিবিড় ও সামগ্রিক জরিপের কাজ করতে গিয়ে পুকুর/দিঘিগুলোর মাহাত্ম টের পেলাম। বা বলা ভালো আ কা মো যাকারিয়া আমাদের পুকুর/দিঘির তাৎপর্য বোঝার দিকে নজর দিতে বাধ্য করলেন।

আদি মধ্যযুগে (খ্রি. ৬ষ্ঠ শতক - ১৩শ' শতক) গৌড় ও বরেন্দ্র নামে পরিচিত এ অঞ্চলে অসংখ্য পুকুর বা দিঘি খোড়া হয়েছে। রাজা বা সামন্তগণ ধর্মীয় স্থাপনার মত এই পুকুর/দিঘি খোঁড়ায় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতেন। জনসমষ্টির উদ্যোগও ছিল বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে দৈনন্দিন জীবনযাপন এবং সেচের কাজে জল ব্যবহারের জন্য পুকুর/দিঘি খনন করায়, সেগুলোর উঁচু পাড়ে ফলজ বৃক্ষ রোপনে। ধর্মীয় স্থাপনার সঙ্গে পুকুরের/জলাধারের অবস্থান শাস্ত্র অনুমোদিত। শত শত পুকুর/দিঘিকে এ কারণেই আমরা প্রথম অন্যান্য নিদর্শনের মতই গুরুত্ব দিতে শুরু করি। কাজ এগুনোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা লক্ষ করি, কেবল ওই সময়ের জল ব্যবস্থাপনার ধরন, বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস বোঝার জন্যই পুকুর/দিঘিগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়। ওই সময়ের মানব বসতিগুলো জমির উপরে কী-ভাবে বিন্যস্ত ছিল, আর বসতিগুলোর আকার কেমন ছিল, প্রকার কেমন ছিল, এক বসতির সঙ্গে অন্য বসতির সম্পর্ক কেমন ছিল, বসতিগুলো কী-ভাবে পরিবর্তিত হলো, বা কেনইবা পরিবর্তিত অথবা পরিত্যক্ত হলো, তা বোঝার জন্য এখানকার নদী ও জমির ইতিহাসের পাশাপাশি পুকুর/দিঘির ইতিহাস বোঝাও সমান জরুরি। আমাদের এই উপলব্ধিতে পৌছালাম আ কা মো যাকারিয়ার সঙ্গে যাত্রা করে। পুকুর/দিঘির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা আর এখানে করব না।

আ কা ম যাকারিয়া স্যার ও তার বিভিন্ন অভিমুখের গবেষণাকর্ম নিয়ে লিখতে চেষ্টা করাটাই আমার জন্য একধরনের ধৃষ্টতা। তিনি বিভিন্ন ভাষা জানতেন। পুঁথি নিয়ে দারুণ কাজ করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় তার অবদান নানান কারণেই অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অসামান্য মাঠকর্মভিত্তিক জরিপ ও বিশ্লেষণ প্রকাশ করার পরেও তিনি প্রচারবিমুখ থেকেছেন। বিশেষ করে আত্মপ্রেম ও আত্মপ্রচারের কালে। কিন্তু আমার কাছে যাকারিয়া স্যারের কাজের তাৎপর্য অন্য আরো কিছু কারণে। মনোযোগের সঙ্গে বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ বইটি পড়লে, কিংবা তার অন্যান্য ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রবন্ধ পড়লে সেটা স্পষ্ট হয়।

ফারসি ও আরবী জানার পাশাপাশি উনার সংস্কৃতেও ভালো দখল ছিল। উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত শিলালিপি ও তাম্রলিপির সঙ্গে মাঠকর্মের মাধ্যমে শনাক্তকৃত প্রত্নস্থানের তুলনামূলক আলোচনা করা, লিপির প্রাপ্তিস্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনকে সম্পর্কিত করে বিশ্লেষণ করা, নদী ও আদি নদী খাতের সঙ্গে লিপিতে প্রাপ্ত নদীসম্পর্কিত তথ্যকে সম্পর্কিত করার ক্ষেত্রে, আমার মতে, তিনি অনন্য। সাম্প্রতিক কিছু ব্যতিক্রমি গবেষণা ছাড়া, উনার এই পদ্ধতি উনার সমসাময়িক অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতও রপ্ত করতে পারেন নাই।

যাকারিয়া স্যারের কাজের আরেকটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের নিবিড় ও বিশদ বর্ণনা। আমরা পরিপ্রেক্ষিত/কনটেক্সট ধারণাটি বিদ্যায়তনের পরিসরে রপ্ত করেছি অনেক পরে। একটি প্রত্নস্থান ও প্রত্নবস্তুর যেখানে পাওয়া যাচ্ছে তার আশেপাশের ভূমিরূপ, নদী, পুরানো নদীখাত, বিল, পুকুর ইত্যাদিসহ সকল কিছুর বর্ণনা তিনি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রত্নস্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সঙ্গে সেই পরিপ্রেক্ষিতের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তার বিরল পর্যবেক্ষণ সামর্থ্যের আর সময়ের তুলনায় অনেক অগ্রসর গবেষণা পদ্ধতির প্রমাণ তার বই ও লেখায় অজস্র রয়েছে।

ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খলজীর তথাকথিত তিব্বত আক্রমনের পথ সম্পর্কে তিনি নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও মেজর রেভার্টির মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তার মত আমার কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে সবচাইতে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত মতামত পর্যালোচনা করার ভঙ্গি। তিনি ওই মতামত প্রদান করার ক্ষেত্রে তৎকালীন নদীব্যবস্থার যে পর্যালোচনা করেছেন, জেমস রেনেল ও ফ্রান্সিস বুকাননসহ ঔপনিবেশিক শাসনামলের বিভিন্ন জরিপের উপাত্ত ও মানচিত্রের পর্যালোচনা যেভাবে ব্যবহার করেছেন, টেক্সচুয়ার উৎসের সঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাত্তের যেভাবে তুলনা করেছেন সেটা কেবল অনুকরণীয়ই নয়; বরং এখনো পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় তার পর্যালোচনার পদ্ধতি বিরল। বখতিয়ার খলজী নদীয়া আক্রমণ করেছিলেন বলে সর্বজনগ্রাহ্য যে মত সেই মতামতকেও তিনি প্রশ্ন করেছেন অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে। মিনহাজের বিবরণীর অনুপুঙ্খ পাঠ ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাত্তের আলোচনার মাধ্যমে তিনি প্রস্তাব করেছেন যে, নদীয়ার বদলে নওডীহ অধিক গ্রহণযোগ্য, আর এই নওডিহ বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জে অবস্থিত। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, যাকারিয়া স্যারের পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনার ভঙ্গি আমরা অনুসরণ করার চেষ্টা করি নাই। এর প্রধান কারণ, উনাকে অনুসরণ করার জন্য যে নিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রয়োজন হয় তা কেউ রপ্ত করতে চায় না।

দক্ষিণ এশিয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণার আরেক প্রতিবন্ধকতা হলো যুগবিভাজন নির্ভরতা। গবেষকগণ এলাকা ও নির্দিষ্ট কালপর্ব/যুগ নিয়ে বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জন করেন ও পরিচিতি লাভ করেন। কেউ 'প্রাচীন' যুগের বিশেষজ্ঞ, কেউ 'মধ্যযুগের' বিশেষজ্ঞ, কেউ ঔপনিবেশিক যুগের বিশেষজ্ঞ। কেউ প্রতীমালক্ষণবিদ্যায় বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জন করেন, কেউ প্রত্নলিপিবিদ্যায়, কেউ মাঠকর্মে, কেউ স্থাপত্যবিদ্যায়। এ ধরনের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে বিভাজিত জ্ঞানের সমস্যা দৃষ্টিগোচর হয় যখন এক প্রকোষ্ঠের জ্ঞানকে আরেক প্রকোষ্ঠের মাপে মানিয়ে নিতে হয়। তাতে করে কোনো সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না।

অন্যদিকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উৎপাদন প্রক্রিয়া ও ধরন, নদীব্যবস্থা, ভূমিরূপসহ সামাজিক, পরিবেশিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহ 'প্রাচীন' ও 'মধ্যযুগের' মধ্যের কৃত্রিম ও স্থানিকভাবে সুনির্দিষ্ট (যদিও বিশ্বজনীন হিসাবে দাবি করা হয়) সীমারেখা মেনে চলে নাই। যাকারিয়া স্যার যুগবিভাজনকেন্দ্রিক জ্ঞানকে সরাসরি প্রশ্ন না করলেও, প্রাচীন ও মধ্যযুগের সীমারেখাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন মাঠ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা থাকার কারণে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে শাসক ও শাসিতের ধর্ম পরিবর্তনের সাথে সাথে, শাসকের বদলের সঙ্গে জনমানুষের নৈমিত্তিক জীবনযাপন বদলে যাওয়া সমস্থানিক না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল, যাকারিয়া স্যারের বিপুল প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ক কর্মকাণ্ডের ধারণাগত ও পদ্ধতিগত মূল্যায়ন করতে আমরা এখনো সক্ষম হই নাই। তাঁকে অনুসরণ করার বাসনা আমাদের জাগ্রত হয় নাই। কারণ এই অনুসরণে বৈষয়িক প্রাপ্তিযোগ সামান্য, চটজলদি খ্যাতি পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম।

এই আলোচনা ছিল প্রসঙ্গে আসার উছিলা। আসল গল্পে ফিরে আসি এবারে। আমরা এখন কাহারোলের মাধাবগাঁওয়ে খনন করছি। ২০১৬ সালের ২৮ জুলাই আমরা (আমি, শুভ, দিদার,

মাসুম, নাসিম ও শহীদুল ভাই) কাহারোল উপজেলার ভেলওয়া গ্রামে যাই। আমি ও শুভ বাদে কেউই প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে প্রত্নতত্ত্ব শেখেনি। দিদারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ২০০১ সালে বিরামপুরের চণ্ডীপুরে জরিপ করার সময়। তখন ও ক্লাশ সিক্সে পড়ে। তারপরে পড়াশুনা বেশি না আগালেও, আমাদের জরিপ ও খনন কাজে অংশ নেয়ার মধ্য দিয়ে ও মাঠ প্রত্নতত্ত্বের কাজ অনেকটাই শিখে গেছে। মাসুমও তেমনইভাবে গত তিন বছরে অনেক কাজ জেনে গেছে। শহীদুল ভাইয়ের ইজি বাইক হলো গত বছর থেকেই আমাদের বাহন। উনি সারাদিনই আমাদের সঙ্গে থাকেন আর নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন কাজ করেন। নাসিম কাহারোলের ছেলে। সাইকেলে করে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘোরা ওর স্বপ্ন। আমরা সবাই যাকারিয়া স্যারকে গুরু জ্ঞান করি।

২০১৪ সালের জরিপে এখানকার প্রত্নস্থানগুলো আমরা নথিভুক্ত করেছিলাম। যাকারিয়া স্যার তার বইয়ে এই গ্রাম থেকে একই সঙ্গে একটি জৈন প্রতীমা, একটি বৌদ্ধ প্রতীমা, একটি ব্রহ্মা প্রতীমা পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রতীমাগুলোর প্রাপ্তিস্থান বর্ণনা করেছেন তিনি ওইখানকার পুকুর ও দিঘির অবস্থানের সাপেক্ষে। তাঁর বর্ণিত প্রত্নঢিবিগুলো অনেক আগেই স্থানীয় মানুষজনের হাতে ধ্বংস হয়ে যায়। একই স্থানে তিনটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতার উপস্থিতির ঘটনাকে যাকারিয়া স্যার কৌতুহলউদ্দীপক হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আমাদের ভেলওয়া সম্পর্কে আগ্রহেরও প্রধান কারণ এটি।

১৯৬৯ সালে তিনি এই গ্রামে এসেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক। কাহারোলের একটি বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রী গোপেশ চন্দ্র রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, 'আপনারা তো দেরি করে ফেলেছেন। স্থানীয় যে মানুষটি তখন তার সঙ্গে ছিলেন তিনি তো মারা গেছেন দুই বছর আগেই। তিনি বেঁচে থাকতে যদি আসতেন তাহলে জানতে পারতেন কোন স্থান থেকে কোন প্রতীমা পাওয়া গেছিল।' আমরা ওই গ্রামে পুনরায় জরিপে যাওয়ার আগ্রহের কথা জানালে গোপেশ স্যার আমাদের সঙ্গ দিতে রাজি হন আগ্রহের সঙ্গে।

আমরা যাই ভেলওয়া গ্রামে। গিয়ে দেখি গোপেশ স্যার ওই গ্রামের বয়স্ক মুরুব্বিদের মধ্যে একজন - শ্রী পশুপতি রায়কে আগেই বলে রেখেছেন। পশুপতি রায়ের বয়স এখন আশি। তার উঠোনেই আমরা বসলাম। অশীতিপর এই ভদ্রলোক ১৯৬৯ সালের এই গ্রামে প্রতীমা নিতে আসা এক ডিসি সাহেবের গল্প বললেন। তিনি জানালেন, ডিসি সাহেব খুবই ভদ্রলোক ও বিনয়ী ছিলেন। জোর করে বা প্রশাসনিক ক্ষমতা দেখিয়ে তিান ওই প্রতীমাগুলো নিয়ে যাননি। 'ডিসি সাহেব সবাইকে ডেকে বললেন, আপনারা যদি এই প্রতীমাগুলোর পূজা করেন তাহলে আমি এগুলো নেব না। তবে সব প্রতীমা তো আমরা চিনি না, বা পূজাও করি না। আমাদের পূজার জন্য তিনি একটি নারায়ণ প্রতীমা (সম্ভবত বিষ্ণু প্রতীমা) রেখে গেলেন। তখন তার সঙ্গে ছিলে প্রফেসর কোবাত সাহেব। ওই নারায়ণ প্রতীমা পরে চুরি হয়ে যায়।' - বলতে থাকেন পশুপতি রায়। তার বাড়িটার সামনেই একটি ঢিবির অবশিষ্টাংশে প্রতিষ্ঠিত 'ঠাকুরের থান'। উপরে একটা বটগাছ। মাটি দিয়ে উঁচু করে থান বানানো। পাশেই পড়ে আছে একটি পাথরের টুকরা, যেটি কোনো স্থাপনার অংশ ছিল। প্রতিমাসে এখানে এখনো হরিবাসর আর নাম-সংকীর্তন হয়। কিছু দূরের বাঁশঝাড় খুড়তে গিয়ে ওই জৈন তীর্থঙ্করের প্রতীমাটি পাওয়া যায় আরো ছোট ছোট অন্য প্রতীমার সঙ্গে। পরে সেটা নিয়ে এসে বর্তমান থানের উপরে বটগাছের কাছে রাখা হয় বলে তিনি জানান। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মধ্যবয়সী কয়েকজন বলেন, জৈন প্রতীমাটি শুরু থেকেই বটগাছের কাছে ছিল।

এ-মতভিন্নতা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কারণ বাঁশঝাড় আর বর্তমানে থানের মধ্যে দুরত্ব ৮-১০ ফুট। সম্ভবত, একই ঢিবির অংশ ছিল। আবার, একই দেবালয়ে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতীমা উপাসনা হওয়াও ইতিহাসে নজিরবিহীন নয়।

মাঠে কাজ করার সময় আমরা যা করি তা যে সামগ্রিক ভাবে নৈর্ব্যক্তিক, বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পারে না সে বিষয়ে এন্তার আলাপ-বাহাস রয়েছে প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, নৃবিজ্ঞানসহ সমাজ বিজ্ঞানের শাস্ত্রগুলোতে। কর্তাসত্তাশ্রয়ীতা/সাবজেকটিভিটি কিংবা আন্তঃকর্তাসত্তাশ্রয়ীতা/ইন্টারসাবজেকটিভিটি আমাদের দেখার, বোঝার ও ব্যাখ্যা করার ধরন-ভঙ্গি-পদ্ধতিকে গঠন করে, আকার দেয় ও বদলে দেয়। প্রত্নতাত্ত্বিক হিসাবে বস্তুনিষ্ঠ ও নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠার অসম্ভব চেষ্টা করার চাইতে অনেক জরুরি হয়ে দাঁড়ায় কাজে-বিবরণীতে-লিখনীতে নিজ সত্তার সঙ্গে মোকাবেলা করতে থাকা। পারিভাষিকভাবে একই বলে আত্ম-প্রতিবর্তীকরণ/সেল্ফ-রিফ্লেক্সিভিটি। মাঠে কাজ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্মৃতি-অনুভূতি-অনুশীলন প্রবলভাবেই উপস্থিত থাকে। শ্রী পশুপতি রায়ের বাচনভঙ্গী ও দেহভঙ্গী ছিল আমার কাছে স্মৃতিউদ্রেককারী। তাকে দেখে মনে পড়ল। শৈশবে দেখা বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক জয়ন্ত স্যারের কথা খাটো করে ধুতি পরা জয়ন্ত কুমার দাশগুপ্তকে দেখতাম, বিনম্র ভঙ্গিতে হেঁটে যেতে। তখন তো আর জানি না যে, 'মনসা মঙ্গল' নিয়ে অসাধারণ গবেষণা করেও তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি পান নাই, যদিও তাঁর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আরেক দিকপাল শশীভূষণ দাশগুপ্ত। পরে, ওই গবেষণাই গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়। পশুপতি রায় জয়ন্ত স্যারের মতন শিক্ষক ছিলেন না। কোবাদ আলী স্যারের অনুজ মোজাম্মেল হোসেন সাহেবও শিক্ষক ছিলেন না তাঁর বড় ভাইয়ের মত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেয়ার পরে চাকরি করে এখন অবসর নিয়েছেন। ভেলওয়ায় তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পরে ফোনেও বেশ কয়েকবার উনার সঙ্গে আলাপ করেছি। এই দুটি মানুষের দেহভঙ্গী ও বাচনভঙ্গীর কোমল নম্রতা ও দৃঢ়তা, বড় হয়ে ওঠার পথে সাক্ষাৎ হওয়া অনেক মানুষের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। মনে করিয়ে দিচ্ছিল যাকারিয়া স্যারের বিনয়ের কথাও। আমরা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মাননা দেব, এই কথা যখন যাকারিয়া স্যারকে জানাই তখন তিনি আমাকে বলেন, 'আমি এই সম্মাননার যোগ্য নই'। সম্মাননা প্রদানের দিন ভাষণেও তিনি একই কথা বলেছিলেন। এই বিনয়, নিরহঙ্কার ও নম্রতা বেশিরভাগ মানুষের মধ্যেই এখন আর দেখি না। আমার পিএইচডি থিসিসটি যাকারিয়া স্যার ও রাজগুরু স্যারকে উৎসর্গ করেছি। যাকারিয়া স্যারকে থিসিস দেখাতে নিয়ে গেলে তিনি বলেছিলেন, 'আমি এই থিসিস উৎসর্গ হওয়ার যোগ্য নই'। প্রত্যুত্তরে আমি বলেছিলাম, আপনি তো যোগ্য বটেই। আমি আপনাকে যে থিসিস উৎসর্গ করতে পেরেছি সেটা আমার পরম সৌভাগ্য ও গর্বের বিষয়। জানিনা উনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কী না।

অধ্যাপক কোবাদ আলী ছিলেন বীরগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের বাংলার শিক্ষক। তিনি ঘুরে বেড়াতেন ঐতিহাসিক নিদর্শনের খোঁজে। জানালেন তাঁর বন্ধু গোপেশ স্যার ও তাঁর অনুজ মোজাম্মেল হোসেন সাহেব। কোবাত আলী স্যার গত হন ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে। সঙ্গে করে নিয়ে যান এই এলাকার ইতিহাসের আর যাকারিয়া স্যারের সঙ্গে মাঠে জরিপকালে সঙ্গ দেয়ার স্মৃতি। যাকারিয়া স্যার বা কোবাত আলী স্যারদের ছায়াসঙ্গী করেই আমরা দেখছিলাম পুকুর, দীঘি, থান, কেটে ফেলা ঢিবি, প্রতীমা খুঁজে পাওয়ার সেই বাঁশঝাড় আর মানুষ।

'বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ' বইটি পড়ে পড়ে যাকারিয়া স্যারের বর্ণনা অনুসরণ করে হারিয়ে যাওয়া প্রতীমা, মানুষ আর প্রত্নঢিবির অবস্থান বোঝার চেষ্টা করলাম। দুটি পুকুর। স্থানীয় লোকজন বলেন 'ছোট সুসকাই' আর 'বড় সুসকাই'। গোপেশ স্যার জানালেন, এই পুকুর দুটির আসল নাম 'শৌচকায়', যা সূচি হওয়া বা পবিত্র হওয়া থেকে এসেছে। পুরনো দলিল ঘেঁটে এই নাম জানা গেছে। উত্তরে আরেকটি পুকুরের নাম 'পাপাহার' (পাপকে আহার করে যে পুকুরের জল)। একটি পুকুরের মধ্যে জঙ্গল হয়ে গিয়েছিল বলে তার নাম 'দলপুকুর'। কাছেই সবচাইতে বড় পুকুরটির নাম 'বায়ান্ন দিঘি'। বায়ান্ন বিঘা জমি কেটে খোঁড়া বলে।

স্থানীয় অধিবাসীরা ঢিবিগুলো কেটে সমান করে ফেলেছে বহু আগে। পুকুরগুলোর উঁচু পাড়ও কেটে সমান করে ফেলা। এ এলাকার মালিকানা দেশভাগ পূর্বকালে ছিল শরৎ চৌধুরীদের। দেশভাগের পরে ভূসম্পত্তি বিনিময় করে ভারত থেকে এখানে আসেন একদল মানুষ। নতুন বসতি তৈরি করেন। তারাও থেকে যাওয়া স্থানীয় অন্য অধিবাসীরা ঢিবিগুলো কেটে সমান করে ফেলেন। নতুন বসত গড়েন। বায়ান্ন দিঘির পাড় কেটে ফেলা হচ্ছে। ভেলওয়া গ্রামের বর্তমানে বসবাস করা অনেক পরিবারই ১৯৪৭ সালের পরে সম্পত্তি বিনিময় করে এখানে এসেছেন। আশ্চর্য! সেই আদি মধ্যযুগের মত পুকুরগুলো এখনো বসত গড়ে তোলার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করছে। সেই গ্রাম, গ্রামের উপাসনালয় লুপ্ত হয়ে গেছে। পুকুরগুলো থেকে গেছে দেশভাগের পরে আপন বসত ছেড়ে আসা উদ্বাস্তু মানুষের নতুন বসতি, নতুন জীবনের, নতুন স্বপ্নের সাক্ষী হয়ে।

কোবাদ আলী স্যারও দেশভাগের পরে এখানে চলে আসা পরিবারের একজন। তিনি এখানকার প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বোঝায় সঙ্গ দিয়েছিলেন যাকারিয়া স্যারকে। বায়ান্ন দিঘির পাড়ে সাঁওতালপাড়ায় বসে কথা বলার জন্য সবচেয়ে মুরুব্বি- নাতার মুর্মুকে খুঁজে বের করলেন গোপেশ স্যার। তিনি তার নিজের বয়স কত জানেন না। তিনি জানালেন, এই বায়ান্ন দিঘি একসময় জলজ জঙ্গলে (স্থানীয় ভাষায়, দল) ভরে গিয়েছিল। আরো শুনলাম, দিঘির মালিকানা নিয়ে মোকদ্দমা চলছে এখন। তা চলুক। কিন্তু যাকারিয়া স্যার, কোবাদ আলী স্যাররা কোথায় গেলেন? ১৯৬৯ সালের ভেলওয়া, প্রতীমা সংগ্রহ, প্রত্নঢিবি, বায়ান্ন দিঘি, শৌচকায় ও পাপাহার পুকুরের গল্প তো তাদের কাছ থেকে শোনা হল না।

এই অঞ্চলে শত সহস্র পুকুর ও দিঘির নাম আমাদের আজও জানা হয় নাই। আধুনিক পানি ব্যবস্থাপনার রাজনীতিতে পুকুর ও দিঘি নির্ভর এই অঞ্চলের পরম্পরাগত পানি ব্যবস্থাপনা বহু আগেই পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এই জলাশয়গুলোর কত বিচিত্র নাম। সেসব নামের কত ব্যঞ্জনা। তাদের নিয়ে কত যাদুর গল্প এখনো লোকের মুখে মুখে ফেরে। পুকুরগুলো তো বেশিরভাগই এখন খটখটে শুকনো। উঁচু পাড় কেটে সমান করে চাষের জমি বানানো হয়েছে অনেক পুকুর আর দিঘি। যে মানুষগুলো এসব পুকুর খুঁড়েছিলেন বা পুকুরের জল ব্যবহার করতেন তারা তো আমাদের শ্রুতি ও স্মৃতি থেকে বিলীন হয়ে গেছেন সেই কবেই। একসময় যে মানুষগুলো ঘুরে ঘুরে পুরনো জিনিস, নিদর্শন, পুঁথি, গল্প, রূপকথা, পুকুর/দিঘি ও তাদের নাম খুঁজে বেড়াতেন, তারাও সবাই হারিয়ে গেছেন। অনেক পুকুর টিকে আছে আজও। কেউ কি ভবিষ্যতে কোনোদিন এই পুকুর, দিঘি, জলাশয়গুলোর নাম জানার চেষ্টা করবে? লিখে রাখবে তাদের কথা ও অলৌকিক কাহিনী? তাদের সঙ্গে লিপ্ত লৌলিক মানুষগুলো এখন অলৌকিক। পুকুর ও দিঘি আর তাদের নিয়ে নানান অলৌকিক গল্পগুলো কি হারিয়ে যাবে কোনো এক দিন আমাদের সামষ্টিক বিস্মরণের তোড়ে?

হেরিটেজ সংরক্ষণের জন্য এখন কত টাকা, কত সেমিনার, কত কথা। আমাদের এই নাগরিক হেরিটেজ-প্রেমে পুকুর ও দিঘির মত প্রত্নস্থান ব্রাত্য। গুরুত্বহীন। অলাভজনক। কেননা সর্বজনের জীবনযাপনের সঙ্গে জমির, নদীর, পুকুরের সম্পর্কের ইতিহাস দিয়ে আমাদের জাতীয়তাবাদী দম্ভ ও বাসনা প্রকাশ করা যায় না। এ বিষয় নিয়ে গবেষণায় টাকাও দেবে না হয়ত কেউ।

পাড়ে দাঁড়িয়ে বাচ্চাদের কাদা থেকে মাছ ধরার কসরৎ দেখতে দেখতে বায়ান্ন দিঘির জলের দিকে তাকালাম। কাঁঠাল গাছের ছায়ায়, সন্ধ্যার আবছা আলোয় সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে মনে হল দিঘির জলের মধ্য দিয়ে যাকারিয়া স্যার দেখছেন। জলের দর্পনে আ কা ম যাকারিয়ার এই অলৌকিক মুখদর্শন কি আমার বিভ্রম?

কলেজ রোড, সেতাবগঞ্জ। ৩০ জুন ও ১ জুলাই, ২০১৬।

লেখাটি সাম্প্রতিক.কম-এ 'প্রত্নতত্ত্বের লৌকিক-অলৌকিক' মাঠে সিরিজের আওতায় ব্লগ হিসাবে প্রকাশিত একই শিরোনামের লেখার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ। পরিমার্জন: ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

লেখক: প্রত্নতত্ত্ববিদ ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থপঞ্জি

১. কবি শুকুর মামুদ বিরচিত
গুপি চন্দ্রের সন্ন্যাস
প্রকাশক: র‍্যামন প্রকাশনী: ফেব্রুয়ারি ২০১৭
প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৭৪

২. বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চম্পাবতী উপ্যাখ্যান
প্রকাশক: দিব্যপ্রকাশ
প্রথম দিব্যপ্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৮
প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ

৩. তবকাত-ই-নাসিরী
মিনহাজ-ই-সিরাজ
প্রথম প্রকাশ: বাংলা একাডেমি, আষাঢ় ১৯৩০, জুন ১৯৮৩
প্রথম দিব্য প্রকাশ সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০০৭
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত

৪. মোজাফ্ফরনামা ও নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানি
করম আলী খান
ও
আজাদ-আল-হোসায়নি
(কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ও স্যার যদুনাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত বেঙ্গল নওয়াবস্ গ্রন্থ অবলম্বনে)
প্রকাশক: বাংলা একাডেমি
প্রথম প্রকাশ: ফাল্গুন ১৪০৪, মার্চ ১৯৯৮

৫. বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ
প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৪
প্রথম দিব্য প্রকাশ সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০০৭
(পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত)

৬. নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা
প্রকাশক: প্রথমা
প্রথম প্রথমা (পরিমার্জিত) সংস্করণ: বৈশাখ ১৪২২, মে ২০১৫

৭. মুক্তিযোদ্ধা রাজাকার ও একটি তরুণী
প্রকাশক: শাহজাহান আবদালী
প্রকাশকাল: একুশে বইমেলা ২০০৯

৮. সিয়ার-উল্-মুতাখ্খিরিন
(বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার ইতিহাস)
মূল রচনা (ফারসি ভাষা)
সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি
মূল ফারসি ভাষা থেকে অনুদিত: (আ কা মো যাকারিয়া), ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ
প্রকাশক: দিব্যপ্রকাশ
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৬

৯. গ্রাম বাঙলার হাসির গল্প
প্রকাশক: স্বরবৃত্ত
তৃতীয় মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০১৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০১১
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৯

১০. প্রশ্নোত্তরে বাঙলাদেশের প্রত্নকীর্তি (প্রথম খণ্ড)
গ্রন্থস্বত্ত: লেখক
প্রকাশকাল: একুশে বইমেলা ২০১০

১১. বাংলাদেশের প্রাচীন কীর্তি
প্রথম খণ্ড (হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগ)
প্রকাশক: পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
প্রথম প্রকাশ: জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২, জুন ১৯৮৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ: আষাঢ় ১৪০০, জুন ১৯৯৩
প্রকাশনী: দীপ্র
প্রথম প্রকাশনা: ফেব্রুয়ারি ২০০৭

১২. গ্রাম বাঙলার হাসির গল্প
প্রথম খণ্ড
প্রকাশনী: গ্রন্থবিকাশ
প্রথম সংস্করণ: একুশে বইমেলা ২০০৩

১৩. বাংলাদেশের প্রাচীন কীর্তি
দ্বিতীয় খণ্ড (মুসলিম যুগ)
প্রকাশক: পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
প্রথম প্রকাশ: ফাল্গুন ১৩৯৩, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ: ফাল্গুন ১৪০০, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪
দীপ্র প্রকাশনী
প্রথম প্রকাশনা: ফেব্রুয়ারি ২০০৭

১৪. The Archaeological Heritage of Bangladesh
Publisher: Asiatic society of Bangladesh (General Secretary)
First Published: November 2011

আলোকচিত্রে

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়

আলোকচিত্রি: কেনটু, জিয়া ইসলাম, কাকলী প্রধান, শেখ হাসান, জয়ীতা রায়, অপূর্ব হাসান
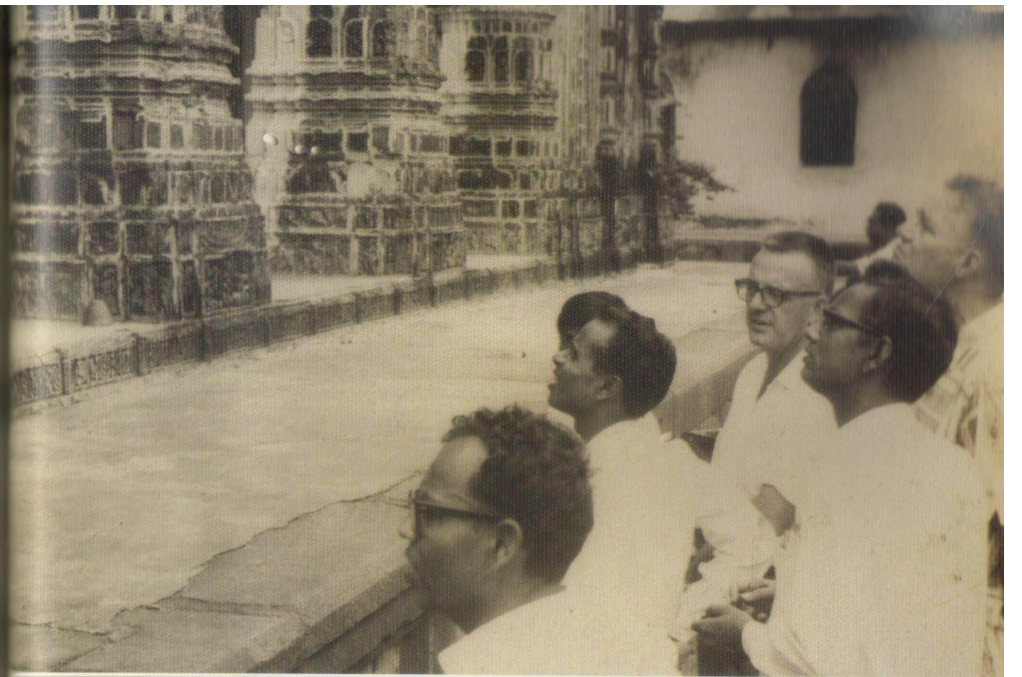
নৌকাবাইচরত
ক্রিড়া সংগঠক
কান্তজিউ মন্দিরে
ভ্রমণে

Ⓐ বাবা-মা
Ⓥ স্ত্রী-সন্তানদের সাথে
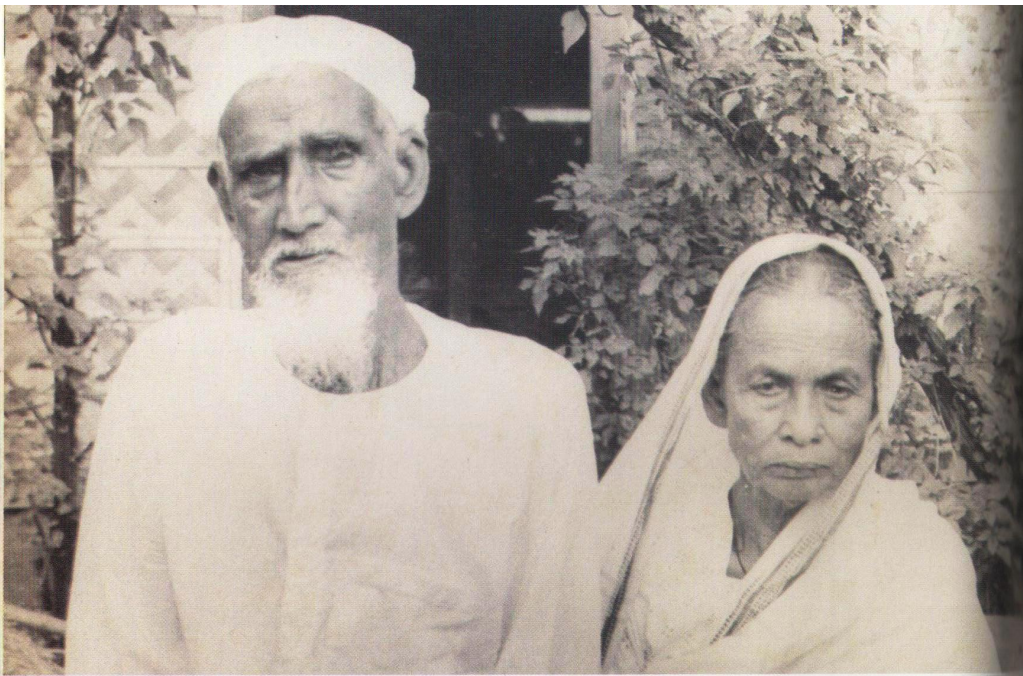
Ⓐ যাকারিয়ার নেতৃত্বে স্বাধীনত্তোর সাংস্কৃতিক দলের প্রথম ভারতে সফর
Ⓥ রাশিয়ায়
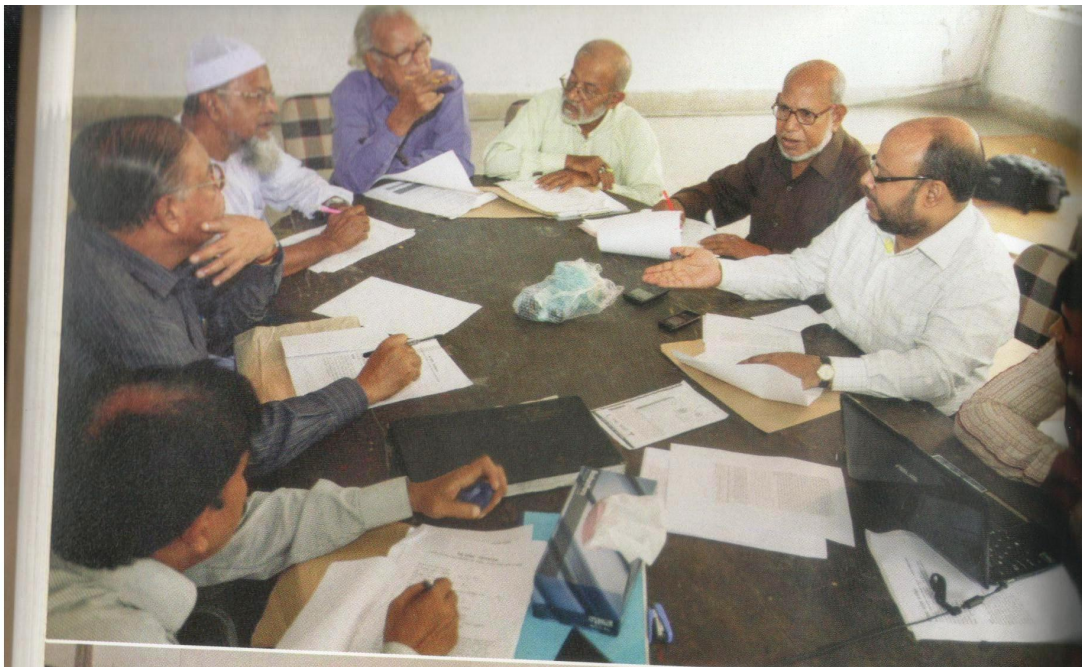
◬ ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির সভায়
⊽ ঢাকার শিলালিপি শীর্ষক প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে

◬ গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির কার্য্যালয়ে স্বপরিবারে
⊽ রাম কৃষ্ণ গোসাই আখড়ায়
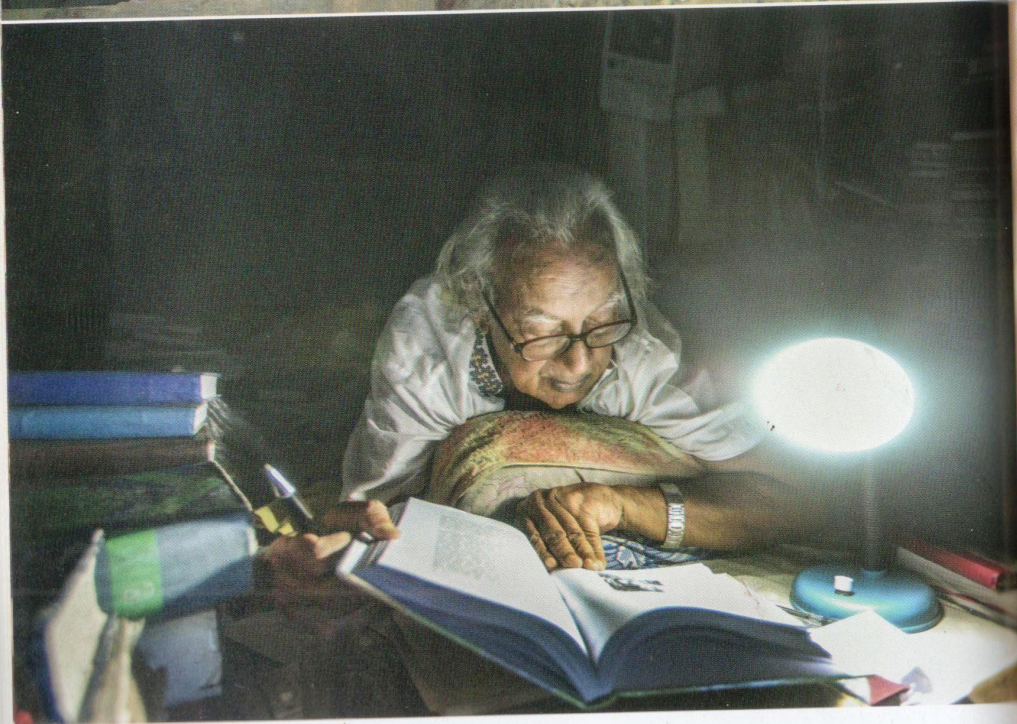
রথখোলার রথের চাকা পর্যবেক্ষণ

অধ্যয়নরত

সরেজমিন

সহজাত অভিব্যাক্তি
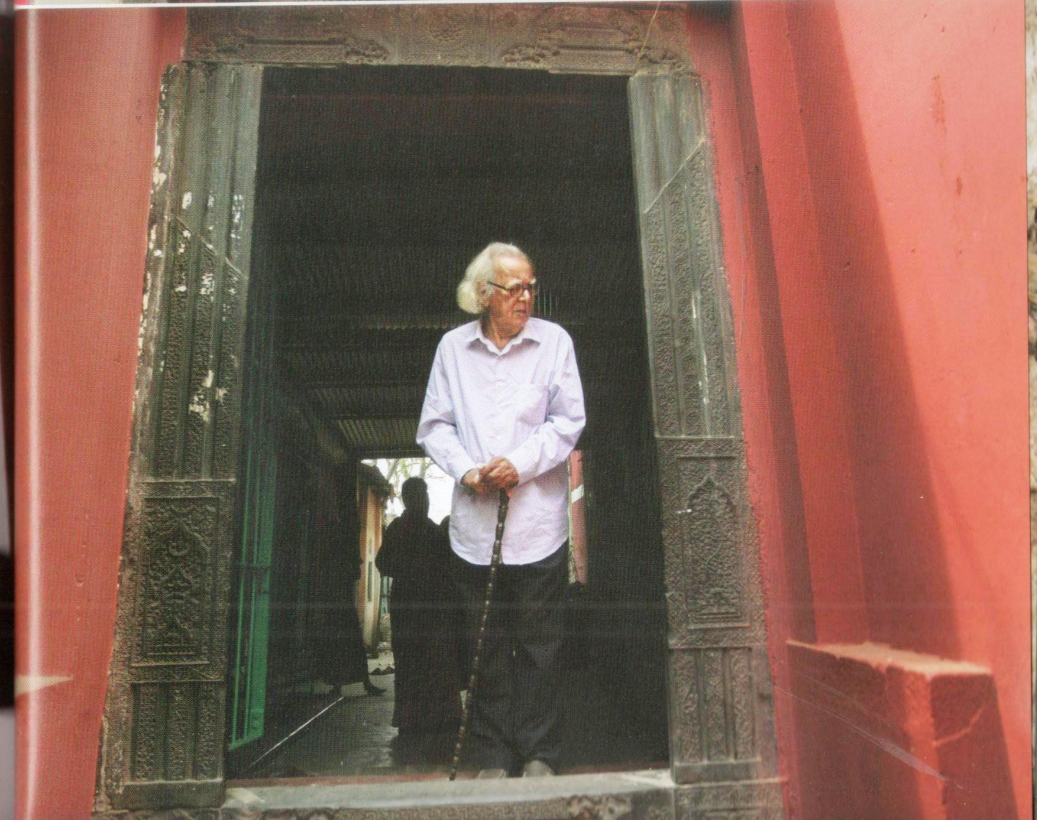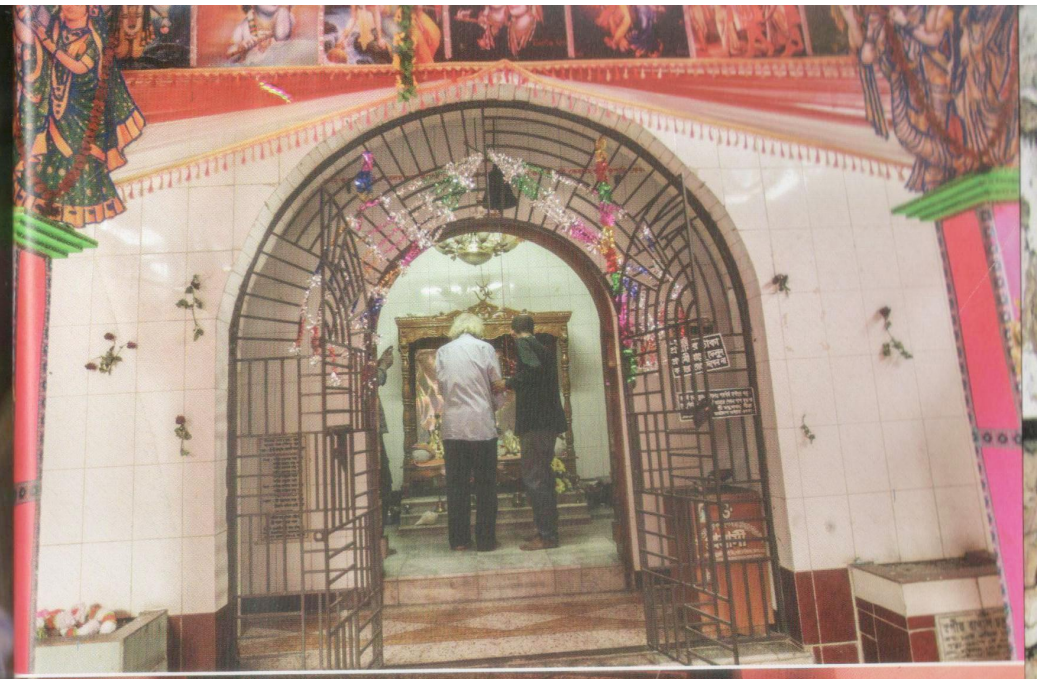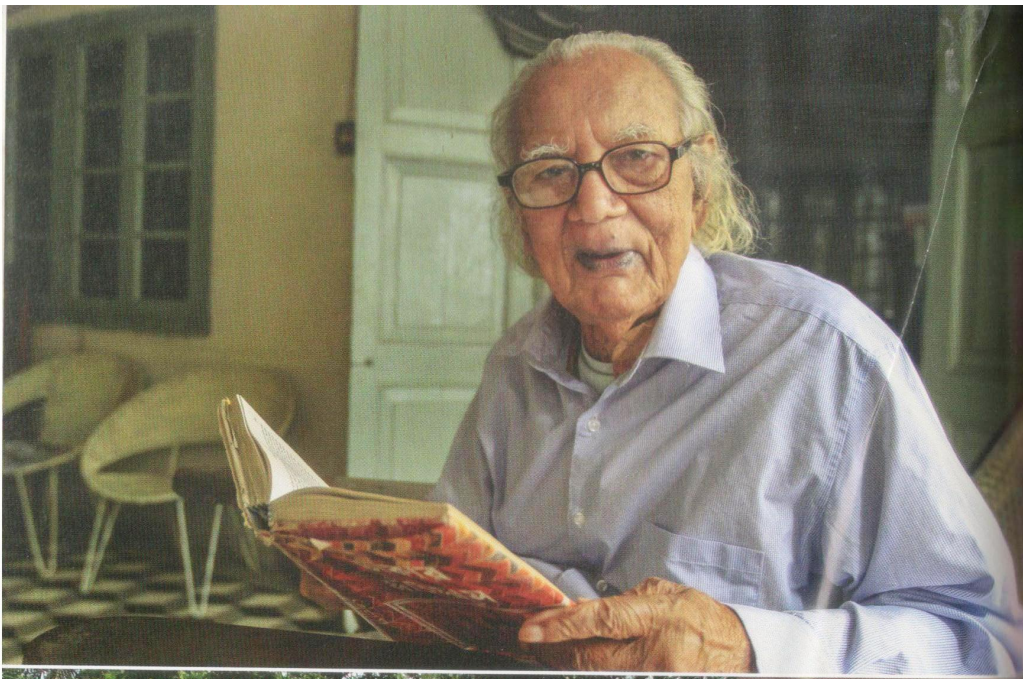
ইতিহাস চর্চায়
শিলালিপি প্রদর্শনীতে

মন্দিরের অন্দরে
ঢাকার ডালপট্টি শিবমন্দিরে
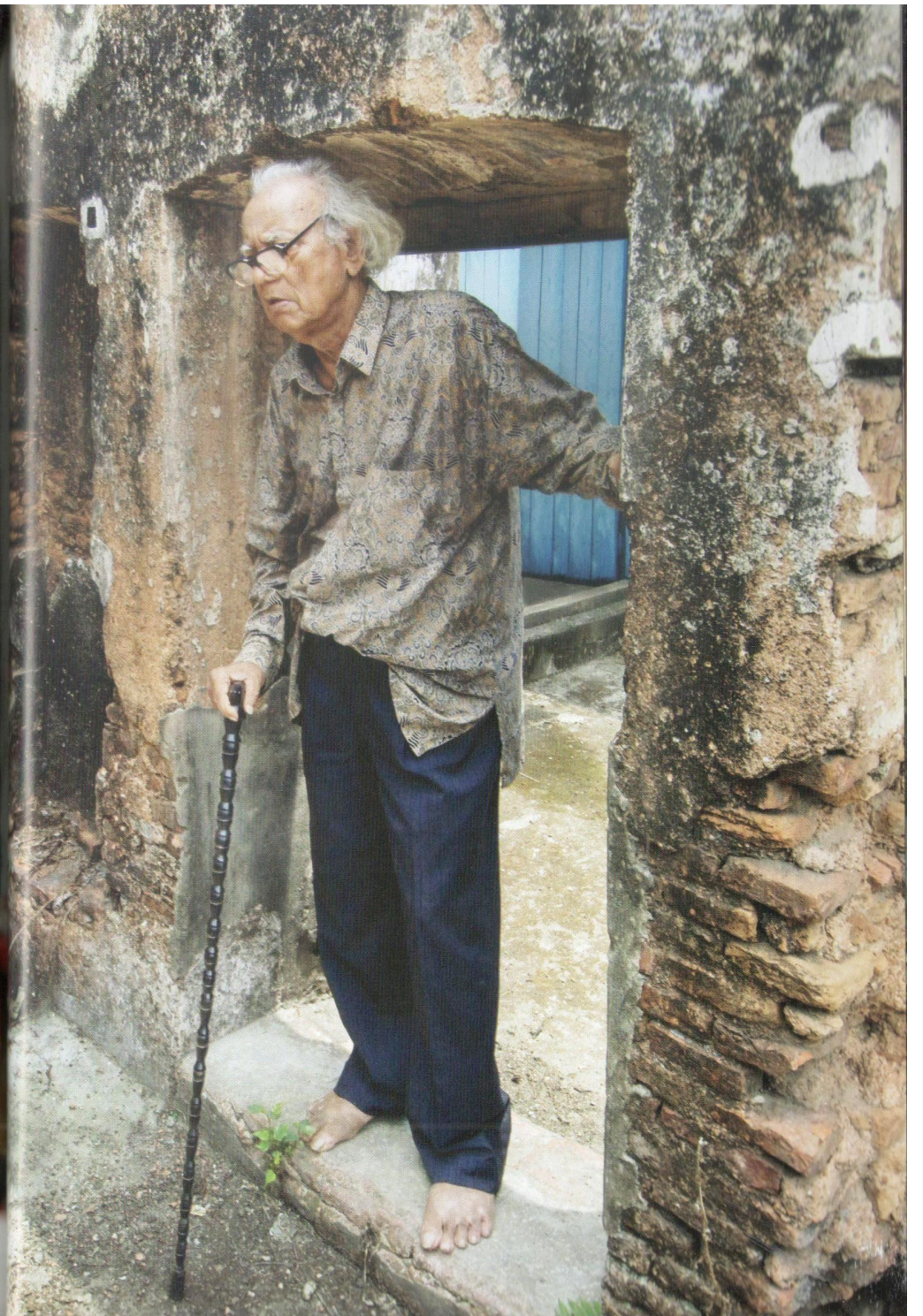
Ⓐ ঢাকার কাপুড়িয়ানগরের পঞ্চমুখ শিবমন্দিরে
Ⓑ সাত রওজা মহল্লার মোহাম্মদী বেগের ইমামবাড়ায়

প্রত্নবস্তু পর্যবেক্ষণ
প্রদর্শনী উন্মোচন

আগা হাসান দানির সাথে
পাঠকক্ষে

৯ পরিবারের সাথে